সূর্যের দিন

এ বাড়ির নিয়ম হচ্ছে যাদের বয়স বারোর নিচে তাদের বিকেল পাঁচটার আগে ঘরে ফিরতে হবে। যাদের বয়স আঠারোর নিচে তাদের ফিরতে হবে ছ'টার মধ্যে।

খোকনের বয়স তেরো বছর তিন মাস। কাজেই তার বাইরে থাকার মেয়াদ ছ'টা। কিন্তু এখন বাজছে সাড়ে সাতটা। বাড়ির কাছাকাছি এসে খোকনের বুক শুকিয়ে তৃষ্ণা পেয়ে গেল। আজ বড়-চাচার সামনে পড়ে গেলে ভূমিকম্প হয়ে যাবে।

অবশ্যি চমৎকার একটি গল্প তৈরি করা আছে। খোকন ভেবে রেখেছে সে মুখ কালো করে বলবে—'সাজ্জাদের সঙ্গে স্কুলে খেলছিলাম, হঠাৎ দেখলাম বিরাট একটা মিছিল আসছে। সবাই খুব শ্লোগান দিচ্ছে—'জাগো বাঙালী জাগো' আমরা দূর থেকে দেখছি। এমন সময় গণ্ডগোল লেগে গেলো। পুলিশের গাড়ির ওপর সবাই ইট-পাটকেল মারতে লাগলো। চারদিকে হৈ চৈ ছোটাছুটি। আমি সাজ্জাদকে সঙ্গে নিয়ে ছুটতে লাগলাম। পেছনে পটাপট শব্দ হচ্ছে, বোধ হয় গুলি হচ্ছে। আমরা আর পেছন ফিরে তাকাইনি, ছুটছিতো ছুটছিই। ফিরতে দেরি হলো এইজন্যে।'

খুব বিশ্বাসযোগ্য গল্প। আজকাল রোজই মিছিল হচ্ছে। আর রোজই গণ্ডগোল হচ্ছে। মিছিলের ঝামেলায় পড়ে যাওয়ার কথা সবাই বিশ্বাস করবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বড়চাচাকে ঠিক সাধারণ মানুষের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাঁর সম্ভবত তিন নম্বর চোখ বলে কিছু আছে, যা দিয়ে তিনি অনেক দূর পর্যন্ত দেখে ফেলেন। কথা বলতে শুরু করেন

অত্যন্ত নিরীহ ভঙ্গিতে। ভাবখানা এ রকম যেন, কিছুই জানেন না। সেবারের ঘটনাটাই ধরা যাক। ফজলুর পাল্লায় পড়ে ফার্স্ট শো সিনেমা (গোলিয়াথ এণ্ড দা ড্রাগন, খুবই মারাত্মক ছবি) দেখে বাড়িতে পা দেয়া মাত্র বড়চাচার সামনে পড়ে গেল। বড়চাচা হাসি মুখে বললেন, 'এই যে খোকন, এই মাত্র ফিরলে বুঝি?'

ঃ জ্বি চাচা।

ঃ একটু মনে হয় দেরি হয়ে গেছে।

ঃ অঙ্ক করছিলাম।

ঃ তাই নাকি?

ঃ জ্বি। ফজলুর এক মামা এসেছেন। খুব ভাল অঙ্ক জানেন। উনি দেখিয়ে দিচ্ছিলেন।

ঃ পাটিগণিত?

ঃ জ্বি পাটিগণিত। পাটিগণিতই উনি ভাল জানেন। তৈলাক্ত বাঁশের অঙ্কটা আজ খুব ভাল বুঝেছি।

বড়চাচা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'একটা মুশকিল হয়ে গেলো খোকন। তোমার দেরি দেখে ফজলুদের বাসায় লোক পাঠানো হয়েছিল। সে কিন্তু তোমাদের দেখতে পায়নি।'

খোকন মহাবিপদেও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে। এবারও পারলো। হাসিমুখে বললো, 'আমরা তো ফজলুর বাসায় অঙ্ক করছিলাম না। ওদের বাসায় খুব গণ্ডগোল হয় তো, তাই আমরা জহিরদের বাসায় গেলাম।'

ঃ এটা ভালই করেছ। পড়াশোনা করবার জন্য নিরিবিলি দরকার। ফজলুর মামা যে তোমাদের জন্যে এতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন সে জন্যে তুমি তাঁকে আমার হয়ে ধন্যবাদ দিও।

ঃ জ্বি চাচা দেব।

ঃ আর তুমি তাঁকে আগামীকাল আমাদের বাসায় চা খেতে বলবে। তুমি নিজে তাঁকে নিয়ে আসবে, কেমন?

খোকন ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। বড়চাচা চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে বললেন—খোকন কি সিনেমা দেখলে?

এই হচ্ছেন বড়চাচা। এ রকম একজন মানুষের ভয়ে যদি কারো বুক কাঁপে তাহলে বোধ হয় তাকে ভীরু বা কাপুরুষ বলা ঠিক হবে না। খোকন এই ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামতে লাগলো।

তবে একতলার সবচে বাঁ দিকের ঘরটিতে আলো জ্বলছে। এটা একটা সুলক্ষণ। এর মানে হচ্ছে বড়চাচার কাছে মক্কেল এসেছে। তিনি মামলার নথিপত্র নিয়ে ব্যস্ত। খোকন এত রাত পর্যন্ত বাইরে এটা বোধ হয় এখনো ধরতে পারেন নি। যা হবার হবে, খোকন খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো।

কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই হলো না। সবাই যেন কেমন খুশি খুশি। উৎসব উৎসব একটা ভাব। ছোটরা চিৎকার চেঁচামেচি করছে, কেউ তাদের বকছে না। বড়চাচী পান বানাতে বানাতে কি গল্প বলে হেসে গড়িয়ে পড়ছেন। ঈদের আগের রাতে যে রকম একটা আনন্দ ভাব থাকে, চারিদিকের অবস্থা সে রকম। কিছু ঘটেছে, কিন্তু এখুনি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। খোকন এমন ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলো যেন সে সরাক্ষণ বাড়িতেই ছিল। অনজু আর বিলু সাপলুডু খেলছিলো। ওদের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। বিলুটা মহা-চোর। তার পড়েছে চার কিন্তু সে পাঁচ চেলে তরতর করে মই বেয়ে উঠে গেলো। পরের বার উঠলো পাঁচ, একেবারে সাপের মুখে। সে আবার চাললো চার। অনজুটা এমন বোকা, কিছুই বুঝতে পারছে না। খোকন বললো---এইসব কি হচ্ছে বিলু ?

ঃ কিছুই হচ্ছে না। তুমি মেয়েদের খেলায় কথা বলতে এসেছ কেন? কোথায় ছিলে সারা সন্ধ্যা?

ঃ ঘরেই ছিলাম। যাবো আবার কোথায়?

খোকন সেখানে আর দাঁড়াল না। চলে এলো দোতলায়। বাবার ঘরে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো---'প্যাথলজি' শব্দের মানে কি। যাতে বাবা বুঝতে পারেন সে পড়াশোনা নিয়েই আছে।

বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করা মুশকিল। তিনি অল্প কথায় কোনো জবাব দিতে পারেন না। প্যাথলজি শব্দের মানে বলতে তিনি পনেরো মিনিট সময় নিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা বললেন, ভেষজ বিজ্ঞানের ইতিহাস বললেন, শারীরবিদ্যায় প্রাচীন গ্রীকদের অবদানের কথা বল-লেন। খোকন চোখ বড় বড় করে শুনলো। তার ভঙ্গিটা এরকম, যেন সে খুব মজা পাচ্ছে। বাবা বক্তৃতা শেষ করে বললেন---যা যা বললাম সব খাতায় লিখে রাখবে।

ঃ জ্বি রাখব।

ঃ লিখবার আগে ছোটদের এনসাইক্লোপিডিয়াটাও দেখে নেবে। আমি হয়ত অনেক পয়েন্টস মিস করেছি।

ঃ আমি দেখে তারপর লিখব।

ঃ গুড্। আর শোন, সন্ধ্যাবেলা তোমার মা তোমার খোঁজ করছিলেন। সারা বিকেল তুমি তার কাছে যাওনি। চারদিকে ঝামেলা টামেলা হচ্ছে, সে খুব চিন্তিত থাকে। যাও দেখা করে এস।

মা থাকেন দোতলায় সবচে শেষ ঘরটায়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। হার্টের খুব খারাপ ধরনের একটা অসুখ, যাতে একটুও নড়াচড়া করা যায় না। রাতের বেলা একজন এ্যাংলো নার্স মিস গ্রিফিন এসে মা'র সঙ্গে থাকে। সে ছেলেদের মত সিগারেট খায়। বাচ্চারা কেউ শব্দ করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেই প্রচণ্ড ধমক দেয়।

মিস গ্রিফিন মা'র ঘরের সামনের বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিলো। খোকনকে দেখেই ভ্রূ কুঁচকে বললো—কি চাও তুমি?

ঃ মা'র কাছে যাব।

ঃ এখন না। এখন ঘুমাচ্ছে। সকালে আসবে। গো এওয়ে।

খোকন নিচে নেমে এসে দেখলো টেবিলে ভাত দেয়া হয়েছে। ফার্স্ট ব্যাচ খেতে বসবে। ফার্স্ট ব্যাচ-হচ্ছে বাচ্চাদের, যাদের বয়স পনেরোর নিচে তাদের। এদের সঙ্গে বসে খেতে খোকনের লজ্জা লাগে। কিন্তু কিছু করার নেই, বড়চাচার নিয়ম। কবির ভাই গত নভেম্বরে পনোরোতে পড়েছেন কাজেই তিনি এখন গম্ভীর মুখে সেকেণ্ড ব্যাচ বড়দের সঙ্গে খেতে বসেন। ফার্স্ট ব্যাচ খেতে বসলেই এক ফাঁকে এসে বলেন, 'আহ্ বড্ড গণ্ডগোল হচ্ছে। খাওয়ার সময় এত কথা কিসের?' খোকনের গা জ্বলে যায়। কিন্তু সহ্য করা ছাড়া উপায় কি?

খেতে বসেই খোকন জানতে পারলো কি জন্যে আজ বাড়িতে এমন খুশি খুশি ভাব। ছোটচাচারা আমেরিকা থেকে ঢাকা চলে আসছেন। বিদেশ আর ভাল লাগছে না। আনন্দে খোকন বিষম খেয়ে ফেললো। ছোটচাচা এখন থেকে এ বাড়িতেই থাকবেন, এরচে আনন্দের খবর আর কিছু হতে পারে নাকি?

ছোটচাচা ফুর্তি ছাড়া এক মিনিটও থাকতে পারেন না। সব সময় তাঁর মাথায় মজার মজার সব ফন্দি আসে। খোকন যখন ক্লাস থ্রীতে পড়ে তখন তিনি একবার ঠিক করলেন ঢাকা শহরের ভিক্ষুকদের গড় আয় কি তা নিয়ে একটা সমীক্ষা চালাবেন। সমীক্ষার বিষয় হচ্ছে একজন ভিক্ষুক দৈনিক কত আয় করে। তারপর একদিন সত্যি সত্যি নকল দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে ময়লা একটা লুঙ্গি পরে খালি গায়ে ভিক্ষা করতে বেরুলেন। দুপুর তিনটার মধ্যে আড়াই সের চাল, এক টাকা

পঁয়ত্রিশ পয়সা এবং একটা ছেঁড়া হলুদ রঙের সোয়েটার পেয়ে গেলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘পেশা হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তি খুব খারাপ না।’ যে লোক এমন একটা কাণ্ড করে তাকে ভাল না বেসে পারা যায়?

খোকন খাওয়া শেষ করে যখন হাত মুখ ধুচ্ছে তখন বড়চাচা বেরুলেন তাঁর ঘর থেকে। খোকনের সামনে দাঁড়িয়ে শান্ত স্বরে বললেন—সাতটা বাজার দশ মিনিট আগে আমি তোমাকে এ বাড়িতে দেখিনি, কোথায় ছিলে? খোকন বলতে চেষ্টা করলো—বাথরুমে ছিলো। বলতে পারলো না। কথা গলা পর্যন্ত এসে আলজিভে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেলো। বড়চাচা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন—চারদিকে হাঙ্গামা হুজুত হচ্ছে, এর মধ্যে তুমি বাইরে। স্বাধীনতা বেশি পেয়ে যাচ্ছো। যাই হোক, তুমি কোথায় ছিলে কি করছিলে তা শুদ্ধ বাংলায় লিখে আজ রাত দশটার মধ্যে আমার কাছে জমা দেবে।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

ঃ কাল সারাদিন ঘর থেকে বেরুবে না। সারাদিন থাকবে দোতলায়। নিচে নামবে না।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

ঃ মিছিল টিছিলে গিয়েছিলে নাকি?

ঃ জ্বি না।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। যাও।

খোকন দোতলায় তার নিজের ঘরে এসে মুখ কালো করে বসে রইলো। কি জন্যে আজ ফিরতে দেরি হয়েছে তা লেখাটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারলো না। বিষয়টা গোপনীয়। কিন্তু বড়চাচার কাছে গোপন করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? নির্ঘাৎ ধরে ফেলবেন।

খোকন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সত্যি কথাই লিখতে শুরু করলো। লেখা হলো সাধু ভাষায়—

‘আজ (২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১) আমরা একটি গোপন দল করিয়াছি। দলটির নাম “ভয়াল-ছয়”। দলের সদস্য সংখ্যা ছয়। সদস্যরা কিছুদিনের মধ্যেই পায়ে হাঁটিয়া পৃথিবী ঘুরিতে বাহির হইবে। আমাদের প্রথম গন্তব্য আফ্রিকার গহীন অরণ্য। কঙ্গো নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।’

প্রায় দশটা বাজে।

ভয়াল-ছয় বাহিনীর দু’জন সদস্যকে দেখা গেল খোকনদের বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করছে। দু’জনই বেশ চিন্তিত। একজনের নাম

শাহজাহান। সে বেশ বেঁটে। তার বন্ধুদের ধারণা, যতই দিন যাচ্ছে ততই সে বেঁটে হচ্ছে। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় সে নাকি এতটা বেঁটে ছিল না। ক্লাসের ছেলেরা তাকে শাহ্জাহান ডাকে না, ডাকে—বল্টু। বেঁটে ছেলেদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সাধারণত খুব লম্বা হয়। কিন্তু শাহ্-জাহানের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম আছে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাজ্জাদও সাইজে শাহ্জাহানের মতই। সাজ্জাদ পড়াশোনা ও মারামারি দুটোতেই সমান দক্ষ বলে তার অন্য কোনো নাম নেই। ক্লাস সেভেনে পড়বার সময় টুনু তাকে দুয়েকবার 'মুরগি' ডাকার চেষ্টা করেছে। সাজ্জাদ টিফিন টাইমে টুনুর নাকে গদাম করে একটা ঘুষি মেরে বলেছিলো, 'আর মুরগি ডাকবি?' টুনু দুহাতে নাক চেপে বললো, 'নাঁ'।

ঃ বল কোনো দিন ডাকব না।

ঃ কোনো দিন ডাঁকব না।

টুনু মুরগি নাম দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করেনি, উল্টো তাকেই সবাই চীনা-মুরগি ডাকতে শুরু করলো। চীনা-মুরগিও ভয়াল-ছয় বাহিনীর একজন সদস্য। তারও খোকনদের বাসায় আসবার কথা ছিল। আসতে পারেনি, কারণ তার ছোট ভাই আজ সকালেই সাইকেলের নিচে পড়ে হাত ছিলে ফেলে। টুনুকে তার ভাইয়ের সঙ্গে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। সাড়ে ন'টার মধ্যে টুনুর চলে আসার কথা। কিন্তু আসছে না। এদিকে খোকনও বেরুচ্ছে না বাড়ি থেকে। সাজ্জাদ বললো, 'কি করবি বল্টু? গেট দিয়ে ঢুকবি খোকনদের বাড়ি?'

ঃ নাহ্।

ঃ নাহ্ কেন? খেয়েতো ফেলবে না? দারোয়ানকে গিয়ে বলব—আমরা খোকনের বন্ধু।

ঃ তুই গিয়ে বল।

সাজ্জাদ সাহস করে গেট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েও ফিরে এলো। খোকনদের বাড়ির দারোয়ানটির চাউনি খুব আন্তরিক মনে হলো না তার কাছে। তার ওপর একটি কুকুর আছে। গেটের কাছে যাওয়া মাত্রই সে এমন একটি ডাক ছাড়লো যাকে কুকুরের ডাক বলে মনে হয় না। বল্টু বললো, 'কিরে ভীতুর ডিম, গেলি না ভেতরে?'

ঃ বড়লোকের বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছে করে না।

বল্টু কিছু বললো না। কারণ এটি তারও মনের কথা। যে বাড়ির ছেলেদের পাঁচ জোড়া জুতো থাকে সে বাড়িতে ঢুকতে ভাল লাগে না।

সাজ্জাদ বললো, 'ঢিল মারলে কেমন হয়? খোকনের ঘরের জানালায় চল ঢিল মারি।'

ঃ কোনটা ওর জানালা?

সাজ্জাদ চুপ করে গেল। খোকনের ঘর কোনটি তা তার জানা নেই। একদিন মাত্র সে এসোছিলো এ বাড়িতে, তাও ভেতরে ঢোকেনি। বল্টু বললো, 'চল দারোয়ানকে গিয়ে বলি ভেতরে খবর দিতে। খোকনকে গিয়ে বলবে, দু'জন বন্ধু এসেছে, খুব জরুরী দরকার।'

ঃ যদি না যায়?

ঃ যাবে না মানে, একশবার যাবে।

ঃ তাহলে তুই গিয়ে বল।

ঃ আমি একা বলব কেন? আমার কি দায় পড়লো?

দু'জনের কাউকেই যেতে হলো না। দেখা গেলো দারোয়ান নিজেই আসছে। গেটের ভেতরে তাকে যে রকম ভয়ংকর মনে হচ্ছিল, এখন আর সেরকম মনে হচ্ছে না।

ঃ আপনাদের ডাকে।

ঃ কে ডাকে?

ঃ বড় সাহেব। আসেন আমার সাথে।

বল্টু এবং সাজ্জাদ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। বড় সাহেব মানে খোকনের বড়চাচা। তিনি তাদের ডাকবেন কেন শুধু শুধু? এই সময় টুনুকে আসতে দেখা গেল। সে বোধ হয় কিছু একটা আঁচ করেছে। সাজ্জাদ দেখলো—টুনু দাঁড়িয়ে পড়েছে। পর মুহূর্তেই টুনুকে লম্বা লম্বা পা ফেলে পাশের গলিতে ঢুকে পড়তে দেখা গেলো। এরকম ভীতুর ডিমকে ভয়াল-ছয়ে ঢোকানো খুব ভুল হয়েছে।

বড়চাচা ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন। ওদের দেখে উঠে বসলেন।

ঃ খোকনের সঙ্গে মনে হয় তোমাদের খুব জরুরী প্রয়োজন। অনেকক্ষণ ধরেই দেখছি ঘুরঘুর করছ।

ওরা জবাব দিল না। বড়চাচা বললেন, 'তোমরা দু'জনেই কি 'ভয়াল-ছয়'-এ আছো?' সাজ্জাদ ও বল্টু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এর মানে কি? ভয়াল-ছয়ের কথাতো তাঁর জানার কথা নয়।

বড়চাচা শান্ত স্বরে বললেন, 'তোমরা কি খোকনের বন্ধু?' উত্তর দিল সাজ্জাদ—

ঃ জ্বি।

ঃ আফ্রিকার গহীন অরণ্যে যাচ্ছ কবে?

প্রশ্নটা করা হল বল্টুকে। বল্টুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমলো।

ঃ খুব শিগগীরই রওনা হচ্ছ নাকি?

ঃ জ্বি।

ঃ পায়ে হেঁটেই যাবে?

ঃ জ্বি।

ঃ প্রথমেই একেবারে আফ্রিকার গহীন অরণ্যে? এই দেশটা একবার দেখে নিলে হত না?

বল্টু বললো, 'এই দেশ আমরা পরে দেখব।'

ঃ আমার মনে হয় প্রথমে নিজের দেশটাই দেখা উচিত। আমি হলে তাই করতাম। বস, তোমরা ঐ চেয়ারে বস।

ওরা বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্লেটে করে সন্দেশ চলে এলো। বড়চাচা বললেন, 'খোকনের সঙ্গে তো আজ দেখা হবে না। ও আজ সারা দিন ঘর থেকে বেরুতে পারবে না।' সাজ্জাদ ও বল্টু দু'জনের কেউই কোনো কথা বললো না। বড়চাচা বললেন, 'জিজ্ঞেস করো কেন খোকন আসবে না?' কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলো না। বড়চাচা বললেন, 'ও কাল রাত ন'টার পর বাড়ি ফিরেছে, সে জন্যে শাস্তি। বুঝতে পারছ?'

ঃ জ্বি পারছি।

ঃ তোমরা ছাড়া আর কে কে যাচ্ছে? সব মিলে ছ'জন না?

ঃ জ্বি না পাঁচজন। টগর আজ সকালে বলেছে সে যাবে না।

ঃ যাবে না কেন?

ঃ ওর নাকি ভয় লাগছে।

ঃ তাহলে তোমরা এখন ভয়াল-পাঁচ?

ঃ জ্বি।

ঃ আমার তো মনে হয় আরো কমবে। শেষ মুহূর্তে অনেকেই পিছিয়ে পড়বে। শেষ মুহূর্তে অনেকের সাহস থাকে না। খাও সন্দেশ খাও।

সাজ্জাদ সন্দেশ খেতে খেতে চারদিকে তাকালো। সিনেমায় বড়-লোকদের বাড়ি যে রকম সাজানো থাকে সে রকম সাজানো। লাল টুক-টুক কার্পেট। ময়লা জুতো পরে কেউ নিশ্চয়ই এ কার্পেটে পা দেয় না।

কার্পেট থেকেই লালাভ একটি আভা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ঘরের দেয়াল ঘেঁষে উঁচু উঁচু চেয়ার। চেয়ারের গদিগুলোও লাল রঙের। মাঝখানের মস্ত টেবিলটি কি পাথরে তৈরি? খোকনকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

ঃ সন্দেশ খাচ্ছো না কেন? যে ক'টি খেতে পার খাও।

গব গব করে পাঁচ ছ'টা সন্দেশ শেষ করে দেয়াটা অভদ্রতা হবে ভেবেই বল্টু ইতস্তত করছিল। বড়চাচা বললেন, 'খেতে ইচ্ছে হলে খাবে। না খাওয়ার মধ্যে কোনো ভদ্রতা নেই।'

সাজ্জাদ এক সঙ্গে দুটো সন্দেশ মুখে পুড়ে দিল। মিষ্টির ভেতরও যে এমন সুন্দর গন্ধ থাকতে পারে তা তার জানা ছিল না। এ মিষ্টিগুলো কি বাড়িতেই তৈরি হয়? সাজ্জাদের হঠাৎ করে বড়লোক হবার ইচ্ছে হলো। খোকনদের মত বড়লোক। বড়চাচা বললেন, 'আচ্ছা তাহলে তোমরা যাও। খোদা হাফেজ।'

বল্টুর ইচ্ছে হলো এগিয়ে গিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলে। মুরব্বীদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে যে রকম করা হয়। কিন্তু সাহসে কুলালো না। যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন বড়চাচা আবার ডাকলেন—'তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি, তোমরা কি মিছিলে যাও? অর্থাৎ আমি জানতে চাচ্ছি ভয়াল-ছয়ের সদস্যরা মিছিলে যায়?' সাজ্জাদ ইতস্তত করে বললো, 'ওরা যায় না, আমি যাই।

ঃ কেন যাও?

সাজ্জাদ জবাব দিতে পারল না।

ঃ এইসব মিছিল টিছিল কেন হচ্ছে জান?

ঃ জানি।

ঃ কেন?

সাজ্জাদ জবাব দিতে পারলো না। বড়চাচা গম্ভীর মুখে বললেন, 'না না তুমি জান না। মিছিল টিছিল করা এখন আমাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথায় কথায় মিছিল। সভা, শোভাযাত্রা। এইসব কি? রাতদিন রাস্তায় চেঁচামেচি করলে মানুষ কাজ করবে কখন?'

সাজ্জাদ কিছু বললো না। বড়চাচা হঠাৎ করে কেন রেগে যাচ্ছেন সে বুঝতে পারছে না।

ঃ আওয়ামী লীগ ইলেকশনে জিতেছে, ভাল কথা। কিন্তু এমন করছে যেন তারা যা বলবে তাই। আরে বাবা পাকিস্তানের কথাওতো শুনতে হবে। হবে কিনা বল?

সাজ্জাদ না বুঝেই মাথা নাড়লো।

ঃ শেখ সাহেবের যে পরিকল্পনা তাতে তো দেশটাই ছারখার হবে। পাকিস্তান আনার জন্যে আমরা কম কষ্ট করেছি? এখন পাকিস্তানের কথা বলে না, সবাই শুধু বাঙালী বাঙালী করে। বাঙালী ছাড়াও তো লোক আছে। পাঞ্জাবী আছে, সিন্ধী আছে, এরা মানুষ না? সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকা যায় না?

ঃ জ্বি যায়।

বড়চাচা গলা উঁচিয়ে বললেন—মিছিলে-টিছিলে কখনো যাবে না। এখন পড়াশোনার সময়, পড়াশোনা করবে। ব্যাস। কথায় কথায় মিছিল, এইসব কি? যাও বাড়ি যাও।

ছুটির দিনে খোকন সাধারণত খুব ভোরে ওঠে। বই নিয়ে পড়তে হবে না, এই আনন্দেই ঘুম ভেঙে যায় সকাল সকাল। এখন সবদিনই ছুটি। অনেক দিন ধরে স্কুল হচ্ছে না। তবু এ বাড়ির নিয়মে ছুটি মাত্র একদিন—শুক্রবার। সেদিন ঘুম থেকে ওঠার জন্যে কেউ ডাকা-ডাকি করবে না। কেউ যদি সারাদিন ঘুমতে চায় তাহলে তাও পারবে। ছোটরা বাড়ির ভেতর চিৎকার চেঁচামেচি করলেও তাদের কোনো প্রশ্ন করা হবে না। টিভির সামনে রাত এগারোটা পর্যন্ত বসে থাকলেও কেউ বলবে না—যাও ঘুমুতে যাও। সেদিন হচ্ছে স্বাধীনতার দিন।

আজ শুক্রবার। খোকন জেগে উঠেছে খুব ভোরে। তার ইচ্ছে হলো কিছুক্ষণ চেঁচিয়ে কাঁদতে। এরকম সুন্দর একটি ঝকঝক দিনে তাকে ঘরে বসে থাকতে হবে? তাছাড়া আজ দুপুরে স্কুলের বারান্দায় ভয়াল-ছয়ের একটি গোপন জরুরী মিটিং বসবে। সে মিটিং-এ সবাই থাকবে, শুধু সে থাকবে না! সবাই হয়তো ভাববে সে আর ভয়াল ছয়ে নেই। তাকে বাদ দিয়েই আজ নিশ্চয়ই সব ঠিকঠাক হবে। খোকন হাত মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। রতনের মা এসে একবার জিজ্ঞেস করলো—নাশতা ঘরে দিয়ে যাবে কি না। খোকন বললো সে আজ নাশতা খাবে না, তার খিদে নেই। রতনের মা দ্বিতীয়বার কিছু বললো না। শুক্রবারে খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি

করা নিষিদ্ধ। কেউ খেতে না চাইলে খাবে না। রতনের মা দু'মিনিট পরেই আবার এসে হাজির।

ঃ দাদাভাই আপনের ডাকে।

ঃ কে ডাকে?

ঃ আপনার আম্মা।

খোকনের মা'র শরীর মনে হয় আজ অন্য দিনের চেয়েও খারাপ। মাথার নিচে তিন-চারটা বালিশ দিয়ে তাঁকে শোয়ানো হয়েছে। মুখ রক্তশূন্য। ঘরের বড় বড় জানালায় ভারী পর্দা ঝুলছে। চারিদিক অন্ধকার। খোকন ঘরে ঢুকতেই তিনি নিচু গলায় বললেন, 'কাল বিকেলে তোকে খুঁজছিলাম, কোথায় ছিলি?' মায়ের সামনে খোকন মিথ্যা বলতে পারে না। সে মৃদুস্বরে বললো—বাইরে ছিলাম।

ঃ মিছিলে টিছিলে যাসনি তো?

ঃ না।

ঃ ঝামেলার মধ্যে যাবি না, কেমন?

ঃ আচ্ছা।

ঃ বোস্ এখানে। দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তুই তো আমার ঘরে আসাই বন্ধ করে দিয়েছিস।

খোকন বসলো। খোকনের মা বললেন—একটা কমলা খাবি?

ঃ না।

ঃ না কেন, খা একটা।

তিনি একটি কমলা বের করে দিলেন।

ঃ আমার কাছে দে, আমি ছিলে দিচ্ছি।

ঃ আমি ছিলতে পারব।

ঃ দে আমার কাছে।

খোকনের মা কমলা ছিলতে লাগলেন। কিন্তু দেখে মনে হলো এইটুকু কাজ করতেই তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। তিনি টেনে টেনে বললেন—মিস গ্রিফিন বলছিলো গণ্ডগোল নাকি প্রায় মিটমাটের দিকে। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে নাকি শেখ মুজিবের মিটমাট হয়ে গেছে। এখন নাকি শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হবে।

খোকন কিছু বললো না।

ঃ মিটমাট হয়ে গেলেই হয়। মনে একটা শক্তি পাওয়া যায়। তাই না খোকন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কিন্তু তোর বাবা বলছিল এত সহজে নাকি কিছু হবে না। পাকিস্তানীরা নাকি চায় না শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হয়। আমি এখন কার কথা বিশ্বাস করি?

খোকন উঠে দাঁড়ালো।

ঃ মা এখন যাই।

ঃ বোস না আরেকটু; বোস।

ঃ পরে আসব।

ঃ আচ্ছা আসিস। মিছিল টিছিলে যাস না কিন্তু লক্ষ্মী বাবা।

ঃ বললাম তো আমি যাই না।

ঃ ঐসব বাচ্চা ছেলেদের জন্যে না।

খোকন নিজের ঘরে এসে মুণ্ডহীন লাশ পড়তে বসলো। মঞ্জুর কাছ থেকে বহু সাধ্য সাধনা করে আনা হয়েছে, কিন্তু পড়তে ভাল লাগছে না। খোকন বই বন্ধ করে জানালার পাশে বসে রইলো। জানালা থেকে দেখা যাচ্ছে টুনুকে। তার জন্যেই ঘুর ঘুর করছে বোধ হয়। যারা সাধারণ গরিব ঘরের ছেলে তাদের মত সুখী বোধ হয় আর কেউ নেই। কেউ তাদের আটকে রাখে না। যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারে। এই যে সাজ্জাদ, মিছিল দেখলেই ঢুকে পড়ে। কেউ তাকে কিছু বলে না। একদিন একা একা গিয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনে এলো।

খোকন জানালা বন্ধ করে দিল। বাইরে তাকিয়ে থাকতেও খারাপ লাগছে। দোতলার সিঁড়িতে অনজু আর বিলু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। খোকন কড়া গলায় ধমক দিল, 'গোলমাল করিস না।' ওরা গোলমাল করতেই লাগলো। করবে জানা কথা। আজ ছুটির দিন। ওরা কোনো কথা শুনবে না। খোকন ভাবলো ছাদে গিয়ে বসে থাকবে। চুপচাপ।

ছাদে যাবার পথে বাবার সঙ্গে দেখা। বাবা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার কি অসুখ করেছে?'

ঃ জ্বি না।

ঃ কাল অনেক রাত পর্যন্ত তোমার ঘরে বাতি জ্বলছিলো, কি করছিলে?

ঃ কিছু করছিলাম না।

ঃ জেগে ছিলে নাকি ?

ঃ জ্বি।

ঃ জেগে ছিলে অথচ কিছুই করছিলে না।

বাবা খুবই অবাক হলেন। খোকনের বাবা রকিব সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন টিচার। ইতিহাস পড়ান। তিনি খুব সহজে অবাক হতে পারেন। তাঁর বেশ কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আছে। যেমন প্রায়ই খোকনের সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে কথা বলেন। সে সময় তাকে তুমি তুমি করে বলেন। অন্য সময় তুই করে।

ঃ খোকন ঠিক করে বল তো তোমার শরীর খারাপ করেনি তো ?

ঃ জ্বি না।

ঃ দেখি এদিকে এসো, জ্বর আছে কি না দেখি।

তিনি খোকনের কপালে হাত রাখলেন।

ঃ না, জ্বর নেই তো।

রকিব সাহেব আবার অবাক হলেন। যেন জ্বর না থাকাটাও অবাক হবার মত ব্যাপার।

ঃ কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলে, কিছু নিয়ে চিন্তা করছিলে নাকি ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমাকে বলতে চাও ? বলতে চাইলে বলতে পার।

খোকন ইতস্তত করতে লাগলো। বাবা বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। মাঝে মাঝে খোকনের প্রতি তাঁর আগ্রহ খুব বেড়ে যায়। খুব খোঁজ খবর করেন। তারপর আবার আগ্রহ কমে যায়। বইপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিছুই আর মনে থাকে না।

ঃ আমরা ছয় জন বন্ধু মিলে একটা দল করেছি। দলের নাম ভয়াল-ছয়।

ঃ বল কি ? খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। দলের কাজ কি ?

ঃ আমরা ভূ-পর্যটন করব।

ঃ ভূ-পর্যটন করবে ?

ঃ হ্যাঁ। প্রথমে যাব আফ্রিকা।

ঃ বাহ্ বেশ মজার তো!

বাবা এবার আর অবাক হলেন না। হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'ছোটবেলায় আমিও একটা দল করেছিলাম। আমাদের দলের কাজ ছিল গুপ্তধন খুঁজে বের করা। কোন গুপ্তধন আমরা

খুঁজে পাইনি। তখন আমার বয়স ছিল বার কি তের। তোমার এখন কত বয়স ?'

ঃ তের বছর চার মাস।

ঃ এই বয়সটাই হচ্ছে দল করবার বয়স।

বাবা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

ঃ কবে যাচ্ছ আফ্রিকায় ?

ঃ এখনো ঠিক হয়নি।

ঃ তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলা দরকার। আমরা সব সময় শুধু পরিকল্পনা করি। কাজ আর করা হয় না। তোমরা যদি একদিন সত্যি সত্যি হাঁটতে শুরু কর তাহলে ভালই হবে। মাইল দশেক যেতে পারলেও অনেক কিছু শিখবে।

বাবা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। খোকন বুঝতে পারলো না, এখন তার কি করা উচিত। চলে যাওয়া উচিত না দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। কারণ বাবার অন্যমনস্কতা খুব বিখ্যাত। একবার শুরু হলে দীর্ঘ সময় থাকে। তখন কাউকে চিনতে পারেন না।

ঃ খোকন।

ঃ জ্বি ?

ঃ ছুটির দিনে তুমি তোমার দলের সঙ্গে না থেকে ঘরে বসে আছ কেন ?

ঃ বড়চাচা বলেছেন আজ কোথাও বেরুতে পারব না।

ঃ ও আচ্ছা। কারণটা কি ?

খোকন কারণ বললো। রকিব সাহেব বললেন, 'শাস্তিটা একটু মনে হয় বেশি হয়ে গেছে। তোমার কি মনে হয় ?'

খোকন কিছু বললো না।

ঃ তোমার বড়চাচা হয়তো ভেবেছেন তুমি মিছিলে টিছিলে গিয়েছ, সে জন্যেই এমন শাস্তি। তুমি গিয়েছিলে নাকি ?

ঃ না।

ঃ কখনো যাও নি ?

খোকন চুপ করে রইলো।

ঃ কয়েকবার গিয়েছ, তাই না ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমার কি মনে হয় জান ? আমার মনে হয় মিছিল করবে যুবকরা। মিছিল হচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা। এ কাজটি যুবকদের জন্যে।

শিশুরা শিখবে, যুবকরা কাজ করবে, বৃদ্ধরা ভাববে। ঠিক না ?

ঃ হ্যাঁ।

রকিব সাহেব হঠাৎ করে খানিকটা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোমার কি ধারণা শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন ?'

ঃ আমি জানি না।

ঃ এ নিয়ে কখনো ভেবেছ ?

ঃ না।

ঃ আমি অবশ্যি অনেক ভেবেছি। আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করা ছাড়া ওদের উপায় নেই। ইলেক-শনে জিতেছেন। কিন্তু ওরা করতে চাচ্ছে না। ওদের অজুহাত বের করতে হবে। কি অজুহাত দেবে সেটাও একটা সমস্যা। সমস্যা নয় ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ এদিকে ভুট্টো সাহেব বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানে আমার দল সবচে বেশি ভোট পেয়েছে। তার মানে কি বলতে পার ?

ঃ না।

ঃ ভুট্টো সাহেবই পাকিস্তানকে দু'টি অংশ হিসেবে ভাবছেন। অথচ তারা দোষ দিচ্ছে আমাদের। ভাবখানা এ রকম যেন আমরাই পাকি-স্তানকে দু'ভাগে ভাগ করতে চাচ্ছি।

ঃ আমরা চাচ্ছি না ?

ঃ ওরা যা শুরু করেছে তাতে চাওয়াই উচিত। আমি অন্তত চাই। তবে যারা একসময় পাকিস্তানের জন্যে আন্দোলন করেছেন, দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই চান না। যেমন তোমার বড়চাচা।

ঃ বড়চাচা চান না ?

ঃ মনে হয় না। তবে আমার ভুলও হতে পারে।

ঃ শেষ পর্যন্ত কি হবে ? পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাবে ?

ঃ নির্ভর করছে ওদের ওপর। ওরা যদি আমাদের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করে তাহলে হয়তোবা ওদের সঙ্গে থাকা যাবে। কিন্তু ওরা আমাদের বিশ্বাস করতে পারছে না। পরিস্থিতি ভাল না।

বাবা কথা শেষ না করেই চটি ফট ফট করে তাঁর ঘরে ঢুকে গেলেন। খোকন চলে গেল ছাদে। এ বাড়ির ছাদটা প্রকাণ্ড। রোজ বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেলে অনজু আর বিলু। চুন দিয়ে ঘর আঁকা আছে।

খোকন বেশ খানিকক্ষণ একা একা ঘুরে বেড়ালো। ঘুর বেড়াতে ভাল লাগছিলো না, আবার নিচে যেতেও ইচ্ছে করছিলো না। এক সময়

রতনের মা এসে বললো—এখন নাশতা দেই ?

ঃ বললাম তো কিছু খাবো না।

ঃ এক গ্লাস দুধ আইন্যা দিমু ?

ঃ না।

ঃ আপনের আম্মা ডাকে।

ঃ একটু আগেই গেলাম। আবার ?

ঃ হ্যাঁ। আসেন আমার সাথে।

খোকন দেখলো তার মা হাঁপাচ্ছেন। অসুখ বোধ হয় খুব বেড়েছে। খোকন বললো—মা ডেকেছো ?

ঃ হ্যাঁ, তুই নাকি কিছু খাস নি ? কেনরে ব্যাটা, কারো ওপর রাগ করেছিস ?

ঃ না।

ঃ আমি তো কোনো খোঁজ খবর করতে পারি না। কি খাস না খাস কে জানে।

ঃ আমি ঠিকই খাই।

মা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—রতনের মা, যাও তো খোকনের খাবার নিয়ে এসো। আমার সামনে বসে সে খাবে। খোকনের একবার ইচ্ছে হলো বলে, ছুটির দিনে খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি করা যাবে না। বড়চাচার নিষেধ আছে। কিন্তু সে কিছু বললো না। মাকে কষ্ট দিতে তার কখনো ইচ্ছে করে না। মা এত ভাল।

ভয়াল-ছয় বাহিনীর তিনজন সদস্যকে স্কুলে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। তিনজনই অত্যন্ত বিমর্ষ। টুনু একটা ঘাসের ডাঁটা চিবুচ্ছে। সাজ্জাদ রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। দলের বাকি সদস্যদেরও এসে পড়ার কথা। কেউ আসছে না। সময় সকাল দশটা। রোদ উঠেছে কড়া। বেশ গরম লাগছে। টুনু বলল—'চল ছায়াতে দাঁড়াই'। কেউ জবাব দিল না। ঐ দিন টুনু কাপুরুষের মত পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে কেউ তার সঙ্গে কথা বলছে না।

এক জায়গায় এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তারা পাঁচিলে উঠে পা ঝুলিয়ে বসলো। পাঁচিলে ওঠা নিষেধ। হেড স্যার খুব রাগ করেন। কিন্তু আজ শুক্রবার, স্কুল বন্ধ। হেড স্যারের এদিকে

আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। যতক্ষণ ইচ্ছে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা যাবে। বল্টু হঠাৎ ফিস্ ফিস করে বললো—'মুনির আসছে'। তিনি জনেই তাকালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। মুনির হন হন করে আসছে। তার হাতে কি একটা বই। গল্পের বই নিশ্চয়ই। ওদের দেখতে পেয়েই সে বই শার্টের নিচে লুকিয়ে ফেললো। মুনিরের সঙ্গে ওদের তেমন ভাব নেই। যে ছেলে প্রতি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয় তার সঙ্গে কারোর ভাব থাকে না। ক্লাশটিচার সোলায়মান স্যারের ধারণা, মুনিরের মত ভাল ছাত্র এই স্কুলে এর আগে আর ভর্তি হয়নি। পরেও হবে না। গত বৎসর স্কুল ম্যাগ্যজিনে তাঁর একটা ইংরেজি গল্প ছাপা হয়েছে। গল্পের নাম—'দি বেগার বয়'। হেড স্যার সেই গল্প আবার স্কুল এ্যাসেম্বলীতে পড়ে শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, 'ক্লাশ সেভেনের ছেলের ইংরেজি দেখলে? বি. এ. এম. এ. পাশরা এমন লিখতে পারবে না। এর গল্পের মরালটা লক্ষ্য করবে। যে ছেলে ভিক্ষা করে তার মধ্যেও মনুষ্যত্ব আছে।'

মুনির স্কুল গেটের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। সন্দেহ ভরা গলায় বললো, 'এই তোরা কি করছিস?'

ঃ কিছু করছি না।

ঃ ওয়ালের ওপর বসে আছিস কেন? হেড স্যার নিষেধ করেছেন না?

ঃ আমরা কারোর নিষেধ মানি না।

ঃ ও, তোরাতো আবার ভয়াল-ছয়।

ভয়াল-ছয়টা মুনির এমন ভাবে বললো যেন খুব একটা হাস্যকর ব্যাপার। সাজ্জাজ চুপ করে রইলো। দলের কথাটা এ রকম জানাজানি হলো কি করে কে জানে। মুনির বললো, 'নিষেধ না মানার মধ্যে কোনো বাহাদুরী নেই।

ঃ না থাকলে নেই, আমরা নিষেধ মানি না।

ঃ কোনো নিষেধ মানিস না?

ঃ না। তোর শার্টের নিচে এটা কি বই?

ঃ 'রাতের আতঙ্ক'। এটা আমি কাউকে দিতে পারব না। এখনো পড়া হয় নি।

ঃ তোর বই আমরা চাই না।

তারা চুপ করে গেল। মুনির চলে যাচ্ছে না, দাঁড়িয়েই আছে। বল্টু বললো, 'তুই চলে যা। দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

ঃ আমি যাই করি তাতে তোর কি?

মুনির ইতস্তত করে বললো—আমাকে দলে নিলে এই বইটা পড়তে দেব। সে শার্টের ভেতর থেকে বই বের করলো। মোটা একটা বই। মলাটে মুখোশ পরা একটা মানুষের ছবি, তার হাতে পিস্তল। অন্য হাতে লম্বা একটি বর্শা।

ঃ কি, নিবি আমাকে দলে ?

ঃ ভাল ছাত্রদের আমরা দলে নিই না।

ঃ কেন, ভাল ছাত্ররা কি দোষ করলো।

ঃ ভাল ছাত্ররা পড়াশোনা করবে। আমরা পড়াশোনা করবো না।

ঃ কি করবি তাহলে ?

ঃ দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াব।

ঃ আমিও ঘুরব তোদের সাথে।

মুনিরকেও দেখা গেলো দেয়ালের ওপর উঠে বসেছে। সে ভয় পাওয়া গলায় বলল—পড়ে যাব না তো ? কেউ উত্তর দিল না।

ঃ আমাকে দলে নিয়েছিস ?

ঃ ভেবে দেখি। দলের অন্যরা যদি রাজি হয়।

ঃ অন্যরা কখন আসবে ?

ঃ আসবে এক্ষুণি।

কিন্তু দলের অন্যদের আসবার আগেই স্কুলের দপ্তরী কালিপদ এসে বললো—'হেড স্যার আপনাদের ডাকে।' টুনুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সাজ্জাদ বিড়বিড় করে বললো, "হেড স্যার কোত্থেকে আসলেন ?" কালিপদ তার জবাব দিল না। হাত ইশারা করে দেখালো। হেড স্যার হোস্টেলের বারান্দায় লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখের ভাব অস্বাভাবিক গম্ভীর।

হেড স্যার প্রথম কিছু সময় কোনো কথাই বললেন না। তারা যে এসে দাঁড়িয়েছে সেটাও যেন চোখে পড়েনি। বেশ কিছুক্ষণ পর মেঘ গর্জন করলেন।

ঃ ওয়ালের ওপর বসেছিলি কেন ?

কোনো জবাব নেই।

ঃ তোর হাতে ওটা কি বই ?

ঃ রাতের আতঙ্ক।

ঃ এইসব আজে বাজে বই পড়তে নিষেধ করেছি মনে নেই ?

সবাই চুপচাপ।

ঃ তোদের বলি নি এখন চারদিকে ঝামেলা হচ্ছে, এখন ঘরে বসে থাকবি ? পাঠ্য বই পড়বি। ট্রানশ্লেসন করবি।

ঃ জ্বি স্যার বলেছেন।

ঃ দু'বছর পর এস.এস.সি পরীক্ষা। খেয়াল আছে ? শাহজাহান, বল তো রাইনোসেরাস মানে কি ?

ঃ গণ্ডার স্যার।

ঃ রাইনোসেরাস বানান কর।

শাহজাহান টেনে টেনে বললো "আর ওয়াই" বলেই থেমে গেল। হেড স্যার আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুনির ফিস ফিস করে বললো, 'স্যার আমি বলবো ?'

ঃ না তোমার বলতে হবে না। যাও এখন ঘরে যাও। খবরদার কোনো মিছিলে টিছিলে যাবে না।

ঃ জ্বি আচ্ছা স্যার।

ঃ আর ঐ বইটা রেখে যাও আমার কাছে। মেট্রিক পাশ করবার আগে কোনো আউট বই পড়বে না। যে সব বই পড়ে কিছু শেখা যায় না সে সব বই পড়ার কি মানে ? বল কোনো মানে আছে ?

ঃ নেই স্যার।

ঃ যাও বাড়ি যাও। আর এই, তুমি ঘাস চিবাচ্চ কেন ? ঘাস খায় ছাগলে, তুমি কি ছাগল ? বল, তুমি ছাগল ?

টুনু মুখ কালো করে বললো, 'জ্বি না স্যার।'

ঃ ঘাস লতা পাতা এইসব যেন আর খেতে না দেখি। যাও বাড়ি যাও।

বড় রাস্তার মোড়ে এসে টুনু বললো—সে বাড়ি চলে যাবে। সাজ্জাদ বললো, 'যেতে চাইলে যা, তোকে আমরা বেঁধে রেখেছি ?' এটা রাগের কথা। এর পর যাওয়া যায় না। এই সময় একটা বেশ বড়-সড় মিছিল আসতে দেখা গেল। সমুদ্র গর্জনের মত গর্জন—"জেগেছে জেগেছে বীর জনতা জেগেছে, জাগো জাগো জাগো, বীর জনতা জাগো।" সাজ্জাদ বললো, 'যাবি নাকি মিছিলে ?' কেউ কিছু বললো না। শুধু মুনির বললো, 'না, স্যার নিষেধ করেছেন।'

ওরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। মিছিলটা প্রকাণ্ড। শেষই হতে চায় না। পেছনে চার পাঁচটা পুলিশের ট্রাক। দেখলেই কেমন ভয় লাগে। মুনির ফিস ফিস করে বললো, 'খুব গণ্ডগোল হবে। চল বাড়ি যাই।'

ঃ তোর ভয় লাগে তুই যা

ঃ কত পুলিশ দেখেছিস ?

ঃ পুলিশকে ভয় পেলে তুই চলে যা। তোকে ধরে রেখেছি নাকি ?

মুনির ইতস্তত করে বললো, 'হেড স্যার দেখলে খুব রাগ করবেন। তাছাড়া বাসায় আজ বড় খালামনির আসার কথা। বড় খালামনি আমাকে না দেখলে খুব রাগ করেন।' সাজ্জাদ বললো, 'তোর আসলে ভয় লাগছে। ভীতুর ডিম কোথাকার!'

মুনির মুখ কালো করে ফেললো, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকলো না। গলির ভেতর ঢুকে পড়লো। মুনিরের সাথে টুনুও চলে গেল। তার নাকি পেট ব্যথা করছে। সাজ্জাদ বললো, 'বল্টু, তুইও যাবি নাকি ?'

ঃ নাহ্।

ঃ কি করবি তাহলে ? মিছিলের সাথে যাবি ?

ঃ হুঁ। কিন্তু কিছু হয় যদি ?

ঃ দূর কি হবে ?

ভয়াল-ছয়ের দুই সদস্য মিছিলে ঢুকে পড়লো। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা। গর্জনে চারদিক কেঁপে কেঁপে উঠছে। একেকটা ঘামে ভেজা মুখ কি ভয়ঙ্কর রাগী। মিছিল যতই এগুচ্ছে, মানুষের সংখ্যা ততই বাড়ছে। যে দিকে তাকানো যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। মিছিল কোন দিকে যাচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সাজ্জাদ আর বল্টু হাত ধরাধরি করে হাঁটছিলো, হঠাৎ কে একজন পেছন থেকে বল্টুর শার্টের কলার চেপে ধরলো। বল্টু ঘার ফিরিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো—জামিল স্যার। অঙ্ক করান, দারুণ রাগী। স্যারের এক হাতে একটা লাল নিশান।

ঃ তোরা এখানে কি করছিস—যা এক্ষুণি বাড়ি যা। এটা হাওয়া খাওয়ার জায়গা ? আর কে কে আছে তোদের সাথে ?

ঃ আর কেউ নেই স্যার।

ঃ ঠিক করে বল।

ঃ না স্যার আমরা দু'জনেই।

ঃ এক্ষুণি বাড়ি যা, খুব গণ্ডগোল হবে। ঐ গলি দিয়ে বেরিয়ে পড়, এক্ষুণি। এক্ষুণি। খুব গণ্ডগোল হবে। দৌড়া, দৌড়া।

স্যারের কথা শেষ হবার আগেই কোথাও কিছু একটা হলো। দারুণ ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল চারদিকে। ঢেউয়ের মত মানুষের স্রোত আসতে লাগলো। দুম দুম শব্দ হল সামনে। গুলির শব্দ না

টিয়ার গ্যাস? কয়েকজন প্রাণপণে চিৎকার করছে, আগুন আগুন! কোনো দিকে নড়ার রাস্তা নেই, তবু এর মধ্যেই সাজ্জাদ প্রাণপণে ছুটছে। বল্টু তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছে। কালো কোট গায়ে দেয়া একটা লোক বললো, 'এই খোকারা মাটিতে শুয়ে পড়। দেখছ কি? গুলি হচ্ছে!' ওরা কি করছে নিজেরা বুঝতে পারছে না। একজন বুড়ো মানুষ বললেন, 'কোন খোলা বাড়ি দেখে ঢুকে পড়।' কোনো বাড়ির দরজা খোলা নেই। সাজ্জাদের মনে হলো সে আর দৌড়াতে পারছে না। ডান পায়ের নখ উঠে গেছে বা কিছু হয়েছে। এবার পেছন থেকে দ্রীম দ্রীম শব্দ আসছে।

একতলা একটি বাড়ির গেটে বুড়ো মানুষ একজন কে যেন দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হাত বাড়িয়ে ওদের ধরে ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললেন।

সেদিন ছিল পহেলা মার্চ। ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেছে সকাল এগারোটায়। বারোটা নাগাদ বাঙালিরা বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। সেই জনসমুদ্র দেখে স্তম্ভিত সরকার দুপুর একটায় ঘোষণা করলো বিকেল পাঁচটা থেকে কার্ফু। কেউ ঘর থেকে বেরুবে না। সেই ঘোষণা বাতিল করে নতুন ঘোষণা দেয়া হলো, কার্ফু বেলা তিনটা থেকে। যে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। রাস্তায় দেখা মাত্র তাদের গুলি করা হবে।

সাজ্জাদ এবং বল্টু আটকা পড়ে গেলো একটা অচেনা বাড়িতে।

খোকনের ছোটচাচা আমিন সাহেব ঢাকা এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছলেন বিকেল তিনটায়। চারদিক কেমন থমথম করছে। প্রচুর পুলিশ। এয়ারপোর্ট থেকে কেউ বেরুতে পারছে না।

আমিন সাহেবকে নেবার জন্য কেউ আসেনি। রাস্তাঘাট ফাঁকা। পুলিশের গাড়ি আর এম্বুলেন্স ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। কাস্টমস্-এর একজন অফিসার বললেন—শহরে কার্ফু জারি হয়েছে। তবে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। আপনাদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।

আমিন সাহেব দু'ঘন্টা অপেক্ষা করলেন। কোনো ব্যবস্থা হলো না। খোকনের ছোটচাচী রাহেলা খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। কারণ প্রিসিলার

হঠাৎ শরীর খারাপ করেছে। দু'বার বমি হয়েছে। জ্বর আসছে মনে হয়। ওকে ডাক্তার দেখানো উচিত। রাহেলা বললেন—এখন আমরা কি করব? সারারাত এয়ারপোর্টে বসে থাকব নাকি?

ঃ অন্যরা যদি বসে থাকে আমরাও থাকব।

ঃ এ আবার কি ধরনের কথা? লোকজনদের সঙ্গে কথাটথা বলে দেখ কিছু করা যায় কি না।

আমিন সাহেব দু'এক জায়গায় টেলিফোন করতে চেষ্টা করলেন। কোনো লাভ হল না। লাইন নষ্ট বা কিছু একটা হয়েছে।

এয়ারপোর্টে বেশ কিছু লোক আটকা পড়েছে। একটি আমেরিকান পারিবারকে দেখা গেল খুব চিন্তিত। ভদ্রলোকের নাম পিটার কল। তিনি যেচে এসে আমিন সাহেবের সঙ্গে কথা বললেন, 'তোমাদের শহরের অবস্থা তো ভয়াবহ মনে হচ্ছে।'

ঃ হুঁ।

ঃ আন্দোলন হচ্ছে শুনেছিলাম, এতটা বুঝতে পারিনি।

নরওয়ে থেকে এক ভদ্রমহিলা এসেছেন, তিনি শহরে ঢুকতে চান না। পরবর্তী ফ্লাইটে নরওয়ে চলে যেতে চান। ইংল্যাণ্ডের দু'টি পরিবার আছে, ওদের সঙ্গে তিনটি ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েগুলো সমস্ত এয়ার-পোর্ট জুড়ে ছোটাছুটি করছে। বাচ্চাগুলোর মাকেও মনে হলো বেশ হাসি খুশি। খুট খুট করে ছবি তুলছে।

আমিন সাহেব ফিরে এসে দেখলেন প্রিসিলা আবার বমি করেছে। তার গায়ে বেশ জ্বর।

ঃ কিরে প্রিসিলা, খারাপ লাগছে?

ঃ নো আই এম জাস্ট ফাইন।

রাহেলা বললেন, 'কিছু ব্যবস্থা করতে পারলে না?'

ঃ না। অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় মশাল মিছিল বের করছে। কেউ কার্ফু মানছে না। গুলিটুলিও হচ্ছে বোধ হয়, শব্দ শুনলাম।

ঃ এখন আমরা কি করব?

ঃ বসে থাক।

ঃ তোমাকে কতবার বলেছি দেশে ফেরার দরকার নেই। শুনবে না।

ঃ গণ্ডগোল হচ্ছে বলে নিজের দেশে ফিরবে না?

ঃ এই রকম দেশে ফিরে লাভটা কি?

আমিন সাহেব প্রিসিলাকে কোলে নিয়ে বসলেন। প্রিসিলা রিন-রিনে গলায় ইংরেজিতে বললো, 'গণ্ডগোল হচ্ছে কেন?'

ঃ গণ্ডগোল হচ্ছে, কারণ আমরা বাঙালিরা বলছি—আমরা মানুষের মত বাঁচতে চাই। পাকিস্তানীরা মানছে না। ওদের ধারণা আমরা মানুষ না।

রহেলা বিরক্ত মুখে বললেন, 'থাক, রাজনৈতিক বক্তৃতা মেয়েকে না শোনালেও হবে।'

ঃ না শোনালে হবে না। এরা আন্দোলনের মধ্যে বড় হবে। এদের জানা দরকার এসব কি জন্যে হচ্ছে।

ঃ এখন না জানলেও হবে। এখন দয়া করে চুপ করে থাক।

আমিন সাহেব চুপ করে গেলেন। প্রিসিলা বললো, 'এ রকম ঝামেলা কতদিন চলবে?'

ঃ বলা মুশকিল। অনেকদিন ধরে চলতে পারে। তবে শুরু যখন হয়েছে, তখন একদিন না একদিন শেষ হবে। শুরু হওয়াটাই শক্ত।

ঃ তোমার কথা বুঝতে পারছি না বাবা, ইংরেজিতে বল।

আমিন সাহেব ইংরেজিতে বললেন, তারপর হাসি মুখে বললেন, 'এখন থেকে তোমাকে বাংলায় কথা বলা শিখতে হবে মা। ভাল করে বাংলা শিখে নাও।'

ঃ হোয়াই ডেডি?

ঃ কারণ তুমি বাঙালি মেয়ে, সেই জন্যে।

রাহেলা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাংলায় কথা বলা শিখতে হবে না। তুমি কথাবার্তা ইংরেজিতেই বলবে। নয়তো ইংরেজি ভুলে যাবে।'

রাত আটটার দিকে একটা মাইক্রোবাস পাওয়া গেল, যেটা বিদেশীদের হোটেলে পৌঁছে দেবে। আটকেপড়া বাঙালিদের সম্পর্কে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমিন সাহেব কথা বলতে গেলেন ওদের সঙ্গে। একজন পাকিস্তানী মিলিটারি অফিসারের দায়িত্বে বাসটি যাবে। আমিন সাহেবকে মিলিটারি অফিসারটি শান্ত ভাবে বললো—ব্যবস্থাটি ফরেনারদের জন্যে।

ঃ কিন্তু আমার মেয়েটি অসুস্থ।

ঃ অসুখ হোক আর যাই হোক, আমার কিছু করার নেই। এই অবস্থার জন্যে দায়ী আপনারা—বাঙালিরা। এর ফল ভোগ করতে হবে আপনাদের।

ঃ আচ্ছা আমাদের না হয় কোনো একটা হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিন।

ঃ একবার তো বলেছি এটা সম্ভব নয়।

ঃ কিন্তু আপনারা বিদেশীদের জন্যে তো করছেন।

ঃ হ্যাঁ, ওরা আমাদের অতিথি।

ঃ আমার মেয়েটিও বিদেশী। ওর জন্ম আমেরিকায়। ও জন্ম-সূত্রে আমেরিকান। ওর আমেরিকান পাসপোর্ট আছে।

ঃ আপনি আমাকে যথেষ্ট বিরক্ত করছেন। আর করবেন না।

আমিন সাহেব গম্ভীর মুখে ফিরে এসে দেখেন প্রিসিলাকে একটা টেবিলে শোয়ানো হয়েছে। একজন রোগামত ভদ্রলোক তাকে পরীক্ষা করছেন। রাহেলা বললো, 'উনি একজন ডাক্তার।'

ডাক্তার সাহেব বললেন—কি হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে বমিটা বন্ধ করা দরকার। মুশকিল হয়েছে আমার সঙ্গে কোনো অষুধপত্র নেই। আমিও আপনাদের মতই আটকা পড়েছি।

ডাক্তার সাহেব থাকতে থাকতেই প্রিসিলা আরো দু'বার বমি করলো। ডাক্তার সাহেব বললেন—ওকে হাসপাতালে ট্রান্সফার করা দরকার। আসুন দেখা যাক একটা এম্বুলেন্স পাওয়া যায় কি না।

কিন্তু এম্বুলেন্স যোগাড় করা গেল না। রাহেলা কাঁদতে লাগলেন। বেশ কয়েকবার বললেন, 'এই জন্যেই দেশে আসতে চাইনি। তবু আসতে হবে। কি আছে এই দেশে?'

আমিন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রিসিলা মা, তুমি কেমন আছ?'

ঃ ভাল। জাস্ট ফাইন।

ঃ ভোর হলেই আমরা তোমার দাদুমনির বাড়ি চলে যাব।

ঃ ভোর হতে কত দেরি?

ঃ বেশি দেরি নেই।

ডাক্তার সাহেব প্রিসিলার কাছেই বসে রইলেন। তাঁরা সবাই অপেক্ষা করতে লাগলেন ভোরের জন্যে।

সম্পূর্ণ অচেনা একটা বাড়িতে ঢুকে পড়া এবং প্রায়ান্ধকার একটি ঘরে নিঃশব্দে বসে থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু বাইরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। বুড়ো ভদ্রলোক সদর দরজা বন্ধ করে

দিয়েছেন। সব ক'টি জানালাও বন্ধ করা হয়েছে। চারদিকে গা চমকানো একটা অন্ধকার। বুড়ো লোকটি সাজ্জাদের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে মোটা ফ্রেমের একটা চশমা। একটু রাগী চেহারা। গায়ে সাদা রঙের একটা চাদর। নুয়ে নুয়ে হাঁটেন।

ঃ তোমার নাম কি?

ঃ সাজ্জাদ।

ঃ আর তোমার নাম?

ঃ শাহ্‌জাহান।

ঃ তোমাদের ভয় লাগছে?

ঃ জ্বি না।

ঃ সাজ্জাদ তোমার পা কেটে গিয়েছে দেখছি, ব্যথা করছে?

ঃ জ্বি না।

ঃ এসো আমার সাথে, পা ধুইয়ে ডেটল লাগিয়ে দিচ্ছি।

ঃ আমার কিছু লাগবে না।

ঃ বাজে কথা বলবে না। বাজে কথা আমি পছন্দ করি না। নীলু। নীলু।

সাজ্জাদ এবং টুনু দেখলো ওদের বয়েসী একটি মেয়ে এসে দরজার ও পাশে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, 'এই মেয়েটি আমার নাতনি, ওর নাম নীলাঞ্জনা। আর এদের একজনের নাম শাহ্‌জাহান। অন্য জনের নাম সাজ্জাদ। বলতো নীলু কার নাম সাজ্জাদ?'

সাজ্জাদ এবং শাহ্‌জাহান মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। বুড়োটা পাগল নাকি? মেয়েটি কিন্তু ঠিকই সাজ্জাদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো। বুড়ো মহাখুশি।

ঃ ঠিক হয়েছে, এখন যাও ডেটল নিয়ে এস। তুলা আন। আর সাজ্জাদ, তুমি বাথরুমে গিয়ে পা ধুয়ে এস। নীলুর সঙ্গে যাও। নীলু দেখিয়ে দেবে।

ঃ আমার কিচ্ছু লাগবে না।

ঃ একটা চড় লাগাবো। যা বলছি কর।

সাজ্জাজ উঠে পড়লো। বাথরুমটা বাড়ির একেবারে শেষপ্রান্তে। নীলু বললো, 'দাদুমণির রাগ খুব বেশি। তিনি যা বলেন তা সঙ্গে সঙ্গে না করলে খুব রাগ করেন।' সাজ্জাদ মুখ গোমড়া করে বললো, 'আমি কাউকে ভয় পাই না।'

ঃ কাউকে না ?

ঃ শুধু হেড স্যারকে ভয় পাই।

ঃ আমার দাদুমণিও তো হেড স্যার।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ হুঁ। অবশ্যি এখন রিটায়ার করেছেন।

ঃ এই বাড়িতে আর কেউ থাকে না ?

ঃ না। শুধু আমরা দু'জন আর একটি কাজের মেয়ে আছে। সে এসে রান্না করে দিয়ে যায়। আজকে আসেনি।

ঃ তুমি কোন ক্লাশে পড় ?

ঃ আমি ক্লাশ সিক্সে পড়ি। এইবার সেভেনে উঠবো।

সাজ্জাজ খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললো, তুমি রাইনোসেরাস বানান করতে পার ?' নীলু অবাক হয়ে বললো—'না রাইনোসেরাস কি ?'

ঃ এক ধরনের গণ্ডার।

ঃ রাইনোসেরাস বানান করার দরকার কি ?

ঃ কোনো দরকার নেই। আমি নিজেও জানি না।

পা ধুতে ধুতে সাজ্জাদের মনে হলো এই ছোট্ট মেয়েটি মন্দ নয়। পায়ে পানি ঢালছে চোখ বন্ধ করে। সাজ্জাদ বললো, 'এই, চোখ বন্ধ করে পানি ঢালছো কেন ?'

ঃ রক্ত দেখতে পারি না যে এই জন্যে। তোমার ব্যথা লাগছে ?

ঃ না। আমার ব্যথা-ট্যথা লাগে না।

ঃ ইস কি মিথ্যুক।

সাজ্জাদ ফিরে এসে দেখে বুড়ো ভদ্রলোক মস্ত একটা জাবদা খাতা খুলে কি যেন লিখছেন। সাজ্জাদকে ঢুকতে দেখেই বললেন, 'তোমরা কোন ক্লাশে পড় ?'

ঃ ক্লাশ সেভেনে।

ঃ সবাই এক স্কুলে পড় ?

ঃ জ্বি।

ঃ মিছিলে গিয়েছিলে নাকি ?

ঃ জ্বি না।

ঃ আবার মিথ্যা কথা।

ঃ জ্বি গিয়েছিলাম।

বুড়ো লোকটি খাতা বন্ধ করে গম্ভীর গলায় বললেন—একটা

জিনিস আমি খুব অপছন্দ করি—সেটা হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে আমি তা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারি।

এই সময় বাইরের রাস্তায় খুব হৈ চৈ হতে লাগলো। ঘন্টা বাজিয়ে একটা দমকল গেল। লোকজন ছোটাছুটি করতে লাগলো। একটা ভারী ট্রাক গেল। সম্ভবত মিলিটারি ট্রাক। বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, 'মনে হচ্ছে আজ রাতটা তোমাদের এখানেই কাটাতে হবে। শোন, নীলু আমাকে দাদুমণি ডাকে। তোমরাও তাই ডাকবে। এখন যাও, নীলুর সঙ্গে গল্প-টল্প কর। পরে তোমাদের সঙ্গে কথা বলব।' দাদুমণি খাতা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এদের বাড়িটি বেশ বড়। অনেকগুলো কামরা নীলুর দখলে। একটিতে নীলুর লাইব্রেরি। সেই লাইব্রেরি দেখে সাজ্জাদ ও বল্টুর আকেল গুড়ুম। একটা পুঁচকে মেয়ের এত বই! নীলু বললো, 'সব আমার দাদুমণি কিনে দিয়েছেন।'

ঃ তুমি পড়েছ সবগুলো?

ঃ পড়ব না কেন?

বল্টু বললো—নীল আতংক পড়েছ, দারুণ বই।

ঃ না পড়ি নি।

ঃ আমি নিয়ে আসব তোমার জন্যে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে নীলু তার সমস্ত সম্পত্তি দেখিয়ে ফেললো। তাদের সবচে মজা লাগলো দাদুমণোর 'মিথ্যা খাতা' দেখে। মিথ্যা খাতায় দাদুমণি সব মিথ্যা খবরগুলো তুলে রাখেন। খবরের শেষে মজার সব মন্তব্য লেখা থাকে। দু'একটা নমুনা দেয়া যাক।

অদ্ভুত গাছ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

> নোয়াখালির ছাগল নাইয়াতে জনৈক আহমেদ আলির একটি অদ্ভুত খেজুর গাছ দেখিবার জন্য মানুষের ঢল নামিয়েছে। উক্ত খেজুর গাছটি নামাজের সময় সেজদার ভঙ্গিতে নুইয়া পড়ে। খেজুর গাছের এই অদ্ভুত কাণ্ডের কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতেছে না।

মন্তব্য ঃ নোয়াখালির ছাগল নাইয়াতে আমি নিজে গিয়েছিলাম। এই জাতীয় গাছের কোনো সন্ধান আমাকে কেহ দিতে পারে নাই। এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারের আসল উদ্দেশ্য কি? বুঝিতে পারিতেছি না।

আম গাছে কাঁঠাল

প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে সম্প্রতি সাতক্ষীরার কুণ্ডচরণ বৈরাগীর একটি আম গাছে প্রকাণ্ড একটি কাঁঠাল ফলিয়াছে। কুণ্ডচরণ আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতাকে জানান যে উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য প্রতিদিন প্রায় হাজার হাজার মানুষ আসিতেছে। সাতক্ষীরা মহকুমার এসডিও সাহেবও আসিয়াছিলেন।

মন্তব্য ঃ আমি সাতক্ষীরার এসডিও সাহেবকে একটি চিঠি লিখে জানতে পারি যে তিনি নিজে সেই কাঁঠাল দেখেন নি, তবে খবর শুনেছেন। আমি পত্রিকার সম্পাদকের কাছে নিজস্ব সংবাদদাতার ঠিকানা জানতে চাই। সম্পাদক সাহেব আমাকে জানান, উক্ত সংবাদ-দাতা বর্তমানে ছুটিতে আছেন।

ছাগলের গর্ভে সর্পশিশু

সম্পতি একটি ছাগল দুটি সর্প-শিশু প্রসব করিয়াছে। ঘটনাটি ঘটে ময়মনসিংহ জেলার নীলগঞ্জে। প্রসবের দুই ঘণ্টার মধ্যে একটি সর্পশিশুর মৃত্যু ঘটে। তবে অন্যটি এখনো সুস্থ আছে। ব্যাপারটি স্থানীয় জনগণের মনে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে।

মন্তব্য ঃ গাঁজাখুরির একটা সীমা থাকা দরকার।

নীলু হাসি মুখে বললো—দাদুমণি মিথ্যা কথা একেবারেই সহ্য করতে পারেন না।

ঃ তিনি নিজে বুঝি সব সময় সত্যি কথা বলেন?

ঃ তা বলেন।

ঃ যখন আমাদের মত ছোট ছিলেন তখনো বলতেন?

ঃ তা তো জিজ্ঞেস করিনি।

সাজ্জাদ গম্ভীর ভাবে বললো—তখন তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলতেন। জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। নীলু হেসে ফেললো। হাসি আর থামতেই চায় না। এই সামান্য কথায় কেউ এত হাসে নাকি?

এক সময় তারা নীলুর পোষা ময়না দেখতে গেল। এই ময়নাটিকে নীলু নিজেই নাকি কথা বলা শিখিয়েছে। এমন ভাবে শিখিয়েছে যাতে মনে হয় ময়না বুঝি সত্যি সত্যি কথা বলে। কেউ কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই ময়না বলবে—

ঃ তোমার নাম কি ? তোমার নাম কি ?

নাম বলার পর ময়না দু এক মিনিট চুপ করে থেকে বলবে--

ঃ তুমি কেমন আছ ?

এই প্রশ্নে জবাব দিলেই ময়না বলবে—ওগো বাড়িতে মেহমান এসেছে। দারুণ মজার ব্যাপার।

বিকেলবেলা দাদুমনি বললেন—এইবার রান্না-বান্না শুরু করা যাক। কি খাবে তোমরা ?

বল্টু গম্ভীর গলায় বললো, 'আমাদের খিদে নেই।'

ঃ এটা তো ঠিক বললে না। তোমার খিদে না থাকতে পারে, কিন্তু অন্যদের নেই সেটা বুঝলে কি করে ?

নীলু খিল খিল করে হেসে উঠলো।

সন্ধ্যার পর বল্টু বিনা নোটিশে কাঁদতে শুরু করলো। দাদুমণি প্রথম কিছুক্ষণ এমন ভাব করলেন যেন দেখতে পাননি। সাজ্জাদ খুব অস্বস্তি বোধ করছিলো। তার ধারণা নীলু খুব হাসাহাসি করবে। কিন্তু নীলু হাসলো না। সেও এমন ভাব করলো যেন কিছু দেখতে পায়নি। শেষ পর্যন্ত দাদুমণি বললেন—তোমার বোধ হয় পেট ব্যথা করছে, তাই না ? বল্টু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, 'হ্যাঁ।'

ঃ আমিও তাই ভেবেছিলাম। বাসার জন্যেও বোধ হয় একটু খারাপ লাগছে : লাগছে না ?

ঃ লাগছে।

ঃ বাসায় তোমার কে কে আছেন ?

ঃ আব্বা আম্মা আর দাদী।

ঃ সকাল হলেই ওরা কার্ফু তুলে নেবে, তখন সবার আগে আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব। কেমন ?

বল্টু মাথা নাড়লো।

ঃ একটা তো মোটে রাত, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। মাঝে মাঝে দেশের খুব বড় দুঃসময় আসে, তখন দেশের মানুষকে কষ্ট করতে হয়। এই যেমন আমরা করছি।

দাদুমণি কিছুক্ষণ থেকে থেমে মৃদু স্বরে বললেন—এই গণ্ডগোল, মিছিল কেন হচ্ছে তোমরা জান ?

ঃ জানি।

ঃ কেন হচ্ছে ?

ঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেছে, সেইজন্যে।

ঃ কিন্তু এর আগেও তো আমরা অনেক মিছিল টিছিল করেছি। করিনি ?

ঃ করেছি।

ঃ সেগুলো কি জন্যে করেছি জান ?

সবাই চুপ করে রইলো। দাদুমণি বললেন, 'তোমাদের এইসব জানা উচিত। চোখের সামনে এত বড় একটা আন্দোলন হচ্ছে। কেন হচ্ছে জানা উচিত না ?'

ঃ জ্বি।

ঃ আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, গোড়ার কথাগুলো অনেকেই জানে না। সমগ্র পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে—এই জিনিসটা জান ?

ঃ না।

ঃ এক ধরনের মানুষ হচ্ছে শোষক, যারা শোষণ করে—আর অন্য ধরনের মানুষ হচ্ছে শোষিত। অর্থাৎ এদের শোষণ করা হয়। পাকিস্তানের জন্ম হল মুসলমানদের নিয়ে। তখন শোষিত মানুষরা ভাবলো আর তাদের দুঃখ কষ্ট থাকবে না। এইবার সুখ আসবে।

সুখ কিন্তু এল না। কারণ পাকিস্তানেও একদল আছে, যারা শোষক। তারা ধনী, তাদের হাতে ক্ষমতা আছে। এদের বেশির ভাগই হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী। দেশের রাজধানীও তাদের অংশে। কাজেই তারা জোরে-শোরে শোষণ শুরু করলো। এবং আমরা পর্ব পাকিস্তানের মানুষেরা হলাম শোষিত। আমাদের শোষণ করতে লাগলো তারা। যাতে কিছুতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি। কাজেই আমরা তাদের ঘৃণা করতে শুরু করলাম। আমাদের এই ঘৃণা তারা কখন প্রথম বুঝতে পারল জান ?

ঃ না, কখন ?

ঃ ভাষা আন্দোলনের সময়।

ভাষা আন্দোলনের সময় তাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। তখন তারা বুঝতে পারলো—আরে পুর্ব পাকিস্তানের এই মানুষগুলো তো সহজ পাত্র নয়। কাজেই তারা এখন খুব সাবধান। এবং আমার কি মনে হয় জান ? আমার মনে হয় এরা কিছুতেই শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা দেবে না।

মুনীর হঠাৎ বলে বসলো—আমাদের হাতে ক্ষমতা আসলে আমরাও কি শোষক হয়ে যাবো ?

ঃ যেতে পারি। হয়তো দেখা যাবে আমরা তখন পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণ করতে শুরু করেছি। তখন হয়তো তারাও আন্দোলন শুরু করবে।

নীলু বললো—এইসব শুনতে ভাল লাগছে না দাদুমণি। একটা ভূতের গল্প বলো। দাদুমণি বললেন, 'এখন আর ভূতের গল্প বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না।' ঠিক তখন কারেন্ট চলে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। উত্তর দিক থেকে খুব হৈ চৈ হতে লাগলো। দাদুমণি দরজা খুলে কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, 'কোথায় যেন আগুন লেগেছে—উত্তর দিকে। বিরাট আগুন।'

রাতের ভাত খাবার সময় রেডিওতে বললো, লেফটেনেন্ট জেনারেল টিক্‌কা খান পূর্ব পাকিস্তানে আসছে।

বল্টু আবার কাঁদতে শুরু করলো। দাদুমণি বললেন—কি হয়েছে বল্টু ? পেট ব্যথা করছে ?

ঃ না, বাসার জন্যে খারাপ লাগছে।

ঃ কার্ফু উঠলেই আমি তোমাকে বাসায় দিয়ে আসবো।

বল্টু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো—যদি কার্ফু না ওঠে ?

কার্ফু তোলা হল সকাল ন'টায়।

চারদিকে কেমন ছমছমে ভাব। যেন কিছু একটা হবে। কি হবে কেউ জানে না, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। যুবকদের চেহারা একই সঙ্গে রাগী ও বিষণ্ণ।

এয়ারপোর্টে আমিন সাহেব মেয়েকে কোলে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। ডাক্তার ভদ্রলোক বললেন—বাসায় না গিয়ে মেয়েকে সরাসরি কোনো হাসপাতালে নিয়ে যান। বডি ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছে। রাহেলা অস্থির হয়ে পড়েছেন—এতক্ষণেও নেবার জন্যে কোন গাড়ি আসছে না কেন ? তিনি বললেন—গাড়ি লাগবে না, চল একটা বেবিটেক্সি নিয়ে চলে যাই।

ঃ এত মালপত্র কি করব ?

ঃ পড়ে থাকুক।

বেবিটেক্সি, রিকশার সংখ্যা খুব কম। বহু কষ্টে একটি জোগাড় করা গেল। রাস্তায় যানবাহন তেমন নেই। কিন্তু প্রচুর মানুষ। ছোট ছোট দল বানিয়ে জটলা পাকাচ্ছে। রাস্তার প্রতিটি মোড়ে ইপিআর-এর বড় বড় ভ্যান। ভ্যানের মাথায় মেশিনগান বসিয়ে সৈন্যরা অপেক্ষা করছে। আমিন সাহেব বললেন—দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র। রাহেলা অবস্থা দেখ।

ঃ তুমি দেখ। আমার দেখার শখ নেই।

ঃ এত সৈন্য নামিয়েছে শহরে, আশ্চর্য!

প্রিসিলা বললো, 'বাবা আমি সৈন্য দেখব।' রাহেলা ধমক দিলেন—সৈন্য দেখতে হবে না। শুয়ে থাক। আমিন সাহেব বললেন, 'ওকে দেখতে দাও। দেখে অভ্যস্ত হোক। এ দেশের অবস্থা জানতে হবে না তাকে?'

ঃ না জানার দরকার নেই। আমি এখানে থাকব না।

ঃ কোথায় যাবে?

ঃ আমেরিকা। যেখান থেকে এসেছি সেখানে যাব।

আমিন সাহেব কিছু বললেন না। রাহেলা বললেন—এ রকম দেশে মানুষ থাকতে পারে?

ঃ কেন, মানুষ থাকছে না? ওরা থাকতে পারলে আমরাও পারব। তাছাড়া এ রকম থাকবে না।

ঃ কি করে তুমি জান থাকবে না?

ঃ এটা জানা যায়। সব খারাপ সময়ের পর আসে সুসময়।

ঃ সুসময় আসুক আর যাই আসুক আমি এখানে থাকব না। তুমি যেতে না চাও থাকবে। আমি প্রিসিলাকে নিয়ে চলে যাব।

আমিন সাহেব কিছু বললেন না।

ফার্মগেটের সামনে এসে দেখা গেল, প্রতিটি গাড়িকে থামানো হচ্ছে। দু'জন মিলিটারি এসে উঁকি দিচ্ছে প্রতিটি গাড়িতে। কাউকে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করছে। আমিন সাহেবকে অবশ্যি কিছু বললো না। হাত দিয়ে ইশারা করে চলে যেতে বললো। প্রিসিলা বললো—ওরা মিলিটারি বাবা?

ঃ হুঁ।

ঃ কি দেখছে?

ঃ কি জানি কি? তোমার শরীর কেমন লাগছে এখন?

ঃ ভাল।

: আবার বমি বমি লাগছে ?

: নাহ্।

: বাড়িতে গেলেই দেখবে শরীর পুরোপুরি সেরে গেছে। বাড়িতে পৌঁছেই ডাক্তার আনাব। ঠিক আছে ?

প্রিসিলা বাধ্য মেয়ের মত মাথা নাড়লো। বাড়ি পৌঁছতে অবশ্যি দেরি হলো অনেক। নীলক্ষেতের সামনে সমস্ত গাড়ি আটকে রাখা হয়েছে। যেতে দেয়া হচ্ছে না। কেন দেয়া হচ্ছে না তাও কেউ বলছে না। রাহেলা অসহিষ্ণু গলায় বললেন—কি হচ্ছে ?

: বুঝতে পারছি না তো!

: আমি অসুস্থ মেয়ে নিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকব নাকি ?

: কিছু তো করার নেই। অপেক্ষা করা যাক। বোধ হয় মিছিল টিছিল আসছে।

: আমি থাকবো না এদেশে, আমি আগামী সপ্তাহেই চলে যাব।

রাহেলা কেঁদে ফেললেন।

খোকন বাড়ির সামনের গেটের কাছে একা একা দাঁড়িয়ে ছিলো। তার খুব ইচ্ছে সে ভয়াল ছয়ের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু বড়চাচা বলে দিয়েছেন—কেউ যেন বাড়ি ছেড়ে কোথাও না যায়। দারোয়ান গেটে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। বড়চাচার হুকুম ছাড়া তালা খোলার অনুমতি নেই। খোকন আশা করে আছে সাজ্জাদ বা বল্টু এদের কেউ তাদের খোঁজে আসবে। কিন্তু এখনো কেউ আসছে না। আসবে জানা কথা, কিন্তু এত দেরি করছে কেন ?

ছোটচাচা যখন বেবিটেক্সি থেকে নামলেন, তখনো খোকন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। তবু সে বুঝতে পারলো না যে ছোটচাচা এসে পড়েছেন। তিনি ডাকলেন—'এটা কে, খোকন না ?' খোকনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

: আমরা যে গতকাল আসছি সে টেলিগ্রাম পাসনি ?

: না তো!

: যা ভেতরে গিয়ে খবর দে।

খোকনের হুঁস ফিরে এলো, সে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল বাড়ির ভেতরে। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির প্রতিটি মানুষ বেরিয়ে এলো। বহুদিন এ বাড়িতে এ রকম আনন্দের ব্যাপার হয়নি।

কার্ফু ভাঙার সাথে সাথেই সাজ্জাদ ও বল্টু বেরিয়ে পড়লো। দাদুমণি সঙ্গে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তারা কিছুতেই সঙ্গে নেবে না। তারা নাকি নিজেরাই যেতে পারবে। নীলুরও দাদুমণিকে ছাড়ার ইচ্ছে নেই। বাসায় তার একা একা থাকতে ভয় লাগে।

দু'জনে প্রথমে গেল বল্টুদের বাসায়—কাওরান বাজারে। বাসায় তখন দারুণ কান্নাকাটি হচ্ছে। তার মা সারা রাত কেঁদেছেন। তিনবার ফিট হয়েছেন। বাবা মা'র পাশেই একটা মোড়াতে বসে আছেন। বল্টুর বড় দু'ভাই কার্ফু ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল নিয়ে খুঁজতে বের হয়েছে। মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন। বাবা বিড় বিড় করে বললেন—আগামী রোববারেই আমি ছুটি নিয়ে সবাইকে দেশের বাড়িতে রেখে আসব। ঝামেলা না মিটলে কাউকে ফিরিয়ে আনব না। বলতে বলতে তিনিও চোখ মুছতে লাগলেন।

সাজ্জাদ কি করবে ভেবে পেল না। চলে যাবে, না আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? কাউকে কিছু না বলে চলে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। আবার এ রকম কান্নাকাটির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতেও ভাল লাগে না। বল্টুর বাবা বললেন—সাজ্জাদ, তুমি আর এ বাড়িতে আসবে না। তোমার পাল্লায় পড়ে ছেলের আজ এই অবস্থা। বুঝতে পারছ? সাজ্জাদ মাথা নাড়লো।

ঃ যাও এখন বাড়ি যাও। দাঁড়িয়ে আছ কেন?

সাজ্জাদদের বাসা তেজকুনী পাড়া। সে থাকে তার বোন এবং দুলাভাইয়ের সঙ্গে। দুলাভাই লেদ মেশিন ওয়ার্কশপের একজন মেকানিক। লোকটি নিরীহ গোছের। সে নিশ্চয়ই সাজ্জাদকে দেখে তেমন কিছু বলবে না। হয়ত বলবে—এই রকম ঘোরাফেরা করা ঠিক না। আর যাবে না। অবশ্যি তার বোন খুবই রাগ করবে। আজ সারাদিন হয়তো কথাই বলবে না। ঘন ঘন চোখ মুছবে।

সাজ্জাদ তাদের বাসার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। কান্নাকাটির শব্দ শোনা যায় কি না। কোন শব্দ নেই, কেউ কাঁদছে না। সে ঘরে ঢুকে দেখলো তার বোন রান্নাঘরে। সাজ্জাদকে দেখেই সে বললো—তোর দুলাভাই কোথায়?

ঃ আমি তো জানি না

ঃ তুই জানিস না মানে? তোর খোঁজে সেই সন্ধ্যাবেলা গেছে, আর তো আসে নি।

ঃ কাফু'র মধ্যে কোথায় গেল ?

ঃ আমি বললাম যাওয়ার দরকার নেই। তবু গেল।

ঃ বল কি !

সাজ্জাদের বোন সরু গলায় বললো—এখন কোথায় কোথায় ঘুরছে কে জানে। বোকা সোকা মানুষ।

ঃ কার্ফু'র মধ্যে আটকা পড়েছে আরকি। আসবে, আসবে এখুনি।

তারা দুই ভাইবোন দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, কেউ এলো না। সাজ্জাদের বোন কান্নাকাটি কিছুই করলো না। সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘরের কাজ করতে লাগলো। দুপুরের পর সাজ্জাদ খুঁজতে বেরুল।

তখন শহরে মিছিলের পর মিছিল বেরুচ্ছে। উত্তেজিত মানুষের মুখে একটি মাত্র কথা—শেখ সাহেবের ভাষণ হবে ৭ তারিখে। সেই ভাষণে দারুণ একটা কিছু বলবেন তিনি।

সাজ্জাদ নানান জায়গায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালো। ফার্মগেট, নীলক্ষেত, আজিমপুর। সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে শুনলো তার বোন ক্ষীণ স্বরে কাঁদছে। দুলাভাই-এখনো ফেরেন নি।

খোকনের বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা চায়ের একটা জমকালো আয়োজন করা হয়েছে। খোকনের মা এবং প্রিসিলা ছাড়া আর সবাই এসে বসেছে খাবার টেবিলে। প্রিসিলার জ্বর কমে গিয়েছে, তবে দুর্বল হয়ে গেছে। বিকেল থেকেই সে ঘুমুচ্ছে। খোকনের একজন মামা পিজির বড় ডাক্তার। তিনি এসে দেখে গিয়েছেন এবং বলেছেন, তেমন কিছু নয়—ট্রাভেল সিকনেস। দু'একদিন পুরোপুরি রেস্টে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।

চায়ের টেবিলে ছোটরা কোনো কথা বলতে পারে না। কিন্তু আজ সবাই কথা বলছে। বড়চাচার মুখ হাসি হাসি। তাঁর হাসি দেখেই মনে হচ্ছে আজ আর তিনি রাগ করবেন না। ছোটচাচা একটির পর একটি মজার মজার গল্প বলে যাচ্ছেন—একবার বেড়াতে গিয়েছিলেন আলাস্কা, সেখানে ঠাণ্ডায় নাকি হঠাৎ তাঁর চোখের মনি জমে গেলো। কিছুই দেখতে পান না। শেষকালে হাতের তালু দিয়ে চোখ ঘষে ঘষে গরম করার পর আবার দেখতে পেলেন।

তারপর একবার স্কুভা ডাইভিং করতে গিয়েছেন প্রশান্ত মহাসাগরে। পানির নিচে বেশিদূর যাননি, অল্প কিছুদূর গিয়েছেন—হঠাৎ তাঁর মনে

হলো পেছন থেকে তাঁর বাঁ হাত ধরে কে যেন টানছে। তিনি চমকে পেছনে ফিরে দেখলেন একটা দৈত্যের মত প্রকাণ্ড অক্টোপাস। অক্-টোপাসটির সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চা। সেগুলো মা'র চারপাশে কিলবিল করছে। ভয়াবহ ব্যাপার!

ঘন্টাখানিক গল্পগুজব হবার পর বড়চাচা চোটদের উঠে যেতে বললেন। হাসি মুখে বললেন—

ঃ অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে, এখন সবাই যাও। আমরা বড়রা কিছু কথা বলি। আজ আর পড়াশোনা করতে হবে না। আজ ছুটি।

এখন বড়দের গল্প মানেই দেশের কথা। কি হবে এই নিয়ে আলোচনা। তর্ক। এখানেও তাই হলো। সাত তারিখে কি বক্তৃতা হবে তাই নিয়ে কথা বলতে লাগলেন সবাই। বড়চাচা গম্ভীর হয়ে বললেন— শেখ সাহেব যা করছেন তার ফল ভাল হবে না! পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি দেশকে দুই ভাগ করে ফেলবার চেষ্টা করছেন।

ঃ এ রকম মনে করার তো কারণ নেই। আছে কোন কারণ? ভুট্টো সাহেবরা যা করছেন সেটাই দেশকে দু'ভাগ করবে। নির্বাচনে যে জিতেছে সে ক্ষমতায় যাবে, এতো সোজা কথা।

ঃ কিন্তু ক্ষমতায় গিয়েইতো দেশকে দু'ভাগ করার চেষ্টা করবে।

ঃ করবার আগেই সেটা বলছেন কেন? অজুহাতটা খুব বাজে না? দুর্বল অজুহাত না? ধরেন আজ যদি ভুট্টো শেখ মুজিবের মত নির্বাচনে জিততো তাহলে কি তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী করা হত না?

বড়চাচা ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়তে লাগলেন এবং রেগে উঠতে লাগলেন। ঠিক তখন খোকন এসে বলল—বড়চাচা আপনার সঙ্গে কথা বলব।

ঃ এখন না, পরে।

ঃ জ্বি না বড়চাচা, এখন। আমার সঙ্গে একটু বাইরের ঘরে আসেন। আসতেই হবে।

বড়চাচা বেশ অবাক হয়েই বাইরের ঘরে এসে দেখলেন সাজ্জাদ দাঁড়িয়ে আছে। সে তার শার্টের লম্বা হাতায় ঘন ঘন চোখ মুছছে।

ঃ সাজ্জাদ না তোমার নাম? কি হয়েছে?

'দুলাভাই হারিয়ে গেছেন' এই খবরটি বলতে সাজ্জাদের দীর্ঘ সময় লাগলো। বড়চাচা নিঃশব্দে শুনলেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'কার্ফু ভঙ্গের জন্য ধরে নিয়ে থানায় রেখে দিয়েছে। থানায় খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। তুমি কাঁদবে না, আমি খোঁজ করছি। তুমি কিছু খেয়েছ?

ঃ জ্বি না।

ঃ খাও কিছু। খোকন তোমার বন্ধুকে কিছু খাবার দিতে বল।

ঃ আমার খিদে নেই, আমি কিছু খাব না।

ঃ সাজ্জাদ তুমি খাও। আমি খোঁজ করছি। কি নাম তোমার দুলাভাইয়ের?

ঃ শমসের আলি।

বড়চাচা প্রথমেই ফোন করলেন রমনা থানায়—আমি মোহাম্মদ রফিক চৌধুরী। আমার একটা খবর দরকার। গতরাতে কার্ফু চালাকালীন সময় শমসের নামের......।

বড়চাচা সব ক'টি থানায় ফোন করলেন। কেউ কোনো খবর দিতে পারলো না। শমসের আলি নামের কেউ গত রাতে গ্রেফতার হয়নি। বড়চাচা ক্রমেই গম্ভীর হতে শুরু করলেন। এক সময় বললেন—'নিজে না গেলে হবে না। খোকন ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বল। সাজ্জাদ তুমিও চল আমার সঙ্গে।'

বড়চাচা রাত দশটা পর্যন্ত নানান জায়গায় ঘোরাঘুরি করলেন। কোনোই খবর পাওয়া গেল না। তিনি রাগী গলায় বললেন—একটা লোক আপনা আপনি নিখোঁজ হয়ে যাবে? এটা একটা কথা হলো? বড়চাচার কপালে ভাঁজ পড়লো। সাজ্জাদ ক্রমাগত চোখ মুছছে। তিনি এক সময় বললেন—'পুরুষ মানুষদের কাঁদতে নেই। কান্না বন্ধ কর। আমি তোমার দুলাভাইকে খুঁজে বের করব। এখানকার ডিসিএমএলএ আমার পরিচিত। কাল দেখা করব তার সঙ্গে। নাকি এখন যেতে চাও?' সাজ্জাদ জবাব দিল না। তিনি বললেন—চল এখনি যাওয়া যাক। ডিসিএমএলএকে পাওয়া গেল না।

সাত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেবেন রেসকোর্সের মাঠে। ভোর রাত থেকে লোকজন আসতে শুরু করেছে। দোকান-পাট বন্ধ। অফিস আদালত কিছু নেই। সবার দারুণ উৎকণ্ঠা। কি বলবেন এই মানুষটি? সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। খুব মন দিয়ে আজ শুনতে হবে তিনি কি বলেন। আজ তাঁকে পথ দেখাতে হবে। শোনাতে হয়ে অভয়ের বাণী।

হাজার হাজার মানুষ জমতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে রেসকোর্সের ময়দান জনসমূদ্রে পরিণত হলো। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী সবাই অপেক্ষা করছে। বাবার কাঁধে চেপে এসেছে শিশুরা। অবাক হয়ে তারা দেখছে এই বিশাল মানুষের সমুদ্রকে।

বহুদূরে অপেক্ষা করছে সারি সারি মিলিটারি ভ্যান। চোখে সানগ্লাস পরা তরুণ অফিসারদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। সম্মিলিত শক্তি—ভয়াবহ শক্তি। ওরা কি বুঝতে পারছে সে কথা ? ঘন ঘন কথা বলছে ওয়ারলেসে। মাথার ওপর দিয়ে অস্থির ভঙ্গিতে উড়ে যাচ্ছে হেলিকপ্টার। বিমান বাহিনীর পদস্থ অফিসাররা হেলি-কপ্টারের জানালা দিয়ে নিচে তাকাচ্ছে, ওদের কপালেও ঘাম। নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত। অপেক্ষা করছে তারাও।

সাজ্জাদ এসেছে খুব ভোরে। সে ঠিক বক্তৃতা শুনতে আসেনি। বক্তৃতা টক্তৃতা তার বিশেষ ভাল লাগে না। সাজ্জাদ এসেছে তার দুলাভাইয়ের খোঁজে। তার মনে ক্ষীণ আশা, কোনো অলৌকিক উপায়ে তাকে হঠাৎ হয়তো পাওয়া যাবে। দেখা যাবে মাঠের প্রান্তে পা ছড়িয়ে চীনাবাদাম খাচ্ছে। সাজ্জাদকে দেখা মাত্রই ডাকবে—এই যে এই। এই সাজ্জাদ। সাজ্জাদ বলবে—আরে দুলাভাই আপনি এখানে!

ঃ আসলাম, দেখি শেখ সাহেব কি বলেন।

ঃ এদিকে আপনার জন্য আমরা অস্থির। আপা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ বরে দিয়েছে।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ আবার বলছেন তাই নাকি। এইসব কি কাণ্ড দুলাভাই। চলেন বাসায় যাই।

ঃ যাব যাব। বস আগে বক্তৃতাটা শুনি। বাদাম খাবে ?

ঃ না।

ঃ আরে খাও না। এই, এই বাদামওয়ালা।

বাস্তবে অবশ্যি সে রকম কিছুই হলো না। কত অসংখ্য মানুষ এসেছে। কিন্তু কারো সঙ্গে কারুর চেহারার কোনো মিল নেই। সাজ্জাদের হঠাৎ মনে হলো এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার তো! সব পশু দেখতে এক রকম। দুটি শেয়ালের মধ্যে প্রভেদ কিছু নেই, কিন্তু মানুষরা কত আলাদা। কেন, এ রকম কেন?

সাজ্জাদ চমকে পেছন ফিরলো। খয়েরী রঙের একটা চাদর গায়ে দিয়ে হেড স্যার দাঁড়িয়ে আছেন। সাজ্জাদের মনে হলো সভাতে আস-

বার জন্যে হেড স্যার প্রথমেই একটা প্রচণ্ড ধমক দেবেন। কিন্তু সে রকম কিছু হলো না। স্যার অস্বাভাবিক নরম গলায় বললেন—সাজ্জাদ একটা খবর শুনলাম তোমার দুলাভাইয়ের সম্পর্কে, এটা কি সত্যি ? ওনাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না ?

ঃ সত্যি স্যার।

ঃ বল কি ! আত্মীয়স্বজনকে খবর দিয়েছে তো ?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ আত্মীয়স্বজন কে কে আছেন ?

সাজ্জাদ চুপ করে রইলো। তার তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। এক মামা আছেন কুড়িগ্রামে, পোস্ট মাস্টার। নিকট আত্মীয় বলতে তিনিই। তাঁর সঙ্গে বহুদিন যাবত যোগাযোগ নেই। হেড স্যার বল-লেন, 'তোমাদের চলছে কি ভাবে ? সঞ্চয় তো মনে হয় তেমন কিছু তোমার দুলাভাইয়ের ছিল না। নাকি ছিল ?' সাজ্জাদ জবাব দিল না। হেড স্যার চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন—কাল তুমি অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করবে। বাসা চেন তো ?

ঃ চিনি স্যার।

ঃ সকালবেলা চলে আসবে।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

ঃ এখানে দাঁড়িয়ে তো কিছু শুনতে পাবে না। আরেকটু সামনে যাওয়া দরকার। চল সামনে যাই।

ঃ আপনি যান স্যার। আমি বাসায় চলে যাব।

ঃ সে কি, ভাষণ শুনবে না ?

ঃ জ্বি না স্যার।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে যাও। কাল সকালবেলা মনে করে আসবে। মনে থাকবে তো ?

ঃ থাকবে স্যার।

সাজ্জাদ বাসায় গেল না। নীলুদের বাসার দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিল। তার একটু লজ্জা করতে লাগলো। এক সপ্তাহ পর আসছে এখানে। দাদুমণি খুব করে বলে দিয়েছিলেন একটা খবর দেয়ার জন্যে।

দরজা খুললো নীলু। সে থমথমে গলায় বললো—খুব বকা খাবে দাদুমণির কাছে। দাদুমণি খুব রেগেছেন তোমার ওপর। আমাকে বলেছেন আসলেও যেন ঢুকতে না দিই।

দাদুমণি অবশ্যি তেমন রাগ করলেন না। কিংবা রাগটা জমা করে রাখলেন, পরে করবেন। তিনি বললেন—তুমি আমি না আসা পর্যন্ত থাকবে এখানে। আমি শেখ সাহেবের ভাষণ শুনতে যাচ্ছি। নীলু বললো—সেতো দাদুমণি রেডিওতে শুনলেই হয়।

ঃ না, এসব জিনিস সভাতে উপস্থিত থেকে শুনতে হয়। রেডিওতে শুধু কথাগুলো শোনা যাবে। কিন্তু বক্তৃতা শুনে মানুষের চোখে-মুখে কি পরিবর্তন হচ্ছে সেটা দেখা যাবে না। আমার কাছে বক্তৃতার চেয়ে এই সব জিনিসই দেখতে ভাল লাগে।

দাদুমণি চলে যাওয়া মাত্র নীলু বললো—তোমাদের কথা আমার রোজ মনে হয়েছে। আশ্চর্য, একবারও তোমরা আসলে না!

ঃ আসলাম তো।

ঃ এক সপ্তাহ পর আসলে। দাদুমণি যতটুকু রাগ করেছে, আমি তার চেয়েও বেশি রাগ করেছি। আমি কোনো কথাই বলবো না।

ঃ আমার একটা বড় বিপদ হয়েছে। আমার দুলাভাইকে খুঁজে পাচ্ছি না।

ঃ খুঁজে পাচ্ছো না মানে?

ঃ কার্ফুর রাতে আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তারপর আর ফিরে আসেননি।

সাজ্জাদের চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করলো। নীলু তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। এক সময় দেখা গেলো সেও কাঁদতে শুরু করেছে। তার পোষা ময়না ক্রমাগত ডাকতে লাগলো, 'কুটুম এসেছে বসতে দাও।'

ঠিক তখনি রেসকোর্সে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা শুরু করলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কথা বলে উঠলো বাংলাদেশ।

> "...আমি যদি তোমাদের কাছে না থাকি
> তোমাদের উপর আমার আদেশ রইলো
> ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা
> কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হও। রক্ত
> যখন দিতে শিখেছি আরো দেব।
> বাংলাকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্।"

Nirjoy

মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে রাহেলা গম্ভীর হয়ে পড়লেন। বেশ জ্বর গায়ে। জ্বরের আঁচে গাল লাল হয়ে আছে। অথচ সকালে বেশ ভাল ছিল। অঞ্জু ও বিলুর সঙ্গে হৈ চৈ করে খেলেছে।

ঃ কেমন লাগছে মা ?

ঃ ভাল লাগছে।

ঃ মাথা ব্যথা করে ?

ঃ নাহ্।

ঃ শরীর খারাপ লাগছে না ?

ঃ না তো।

রাহেলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'তুমি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই আমরা নর্থ ডাকোটায় চলে যাবো।'

ঃ আমি যেতে চাই না মা।

ঃ যেতে চাও না কেন ? আমেরিকা তোমার ভাল লাগে না ?

ঃ লাগে।

ঃ তাহলে যেতে চাও না কেন ? কি আছে এখানে বল ? হৈ চৈ গণ্ডগোল। ছিঃ ছিঃ। আমেরিকাতে আমরা ভাল ছিলাম না ?

ঃ ছিলাম।

ঃ এবার গিয়েই আমরা একটা বাড়ি কিনে ফেলব। বড় একটা দোতলা বাড়ি। সেখানে বেসমেন্টে থাকবে তোমার খেলার ঘর। শীতের সময় যখন বরফ পড়বে, তখন আমরা দু'জনে মিলে স্নোম্যান বানাবো কেমন ? গাজর দিয়ে বানাবো নাক। কালো বোতাম দিয়ে চোখ, কেমন ?

প্রিসিলা জবাব দিল না। ঘরের দরজায় অঞ্জু আর বিলু উঁকি দিচ্ছিল। তাদের হাতে লুডু বোর্ড। রাহেলা বললেন, 'প্রিসিলার জ্বর। প্রিসিলা খেলবে না। তোমরা এখন ওকে বিরক্ত করবে না।'

প্রিসিলা বললো, 'মা আমি ওদের সঙ্গে খেলতে চাই।'

ঃ না। তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকবে।

ঃ শুয়ে থাকতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না।

ঃ ইচ্ছে না হলেও থাকবে। আমি ডাক্তারকে টেলিফোন করছি।

রাহেলা নিচে নেমে গেলেন। নিচে গিয়ে দেখলেন কবীর পাংশু মুখে বসে আছে একটা চেয়ারে। তার ঠোঁট কাটা, সেখানে রক্ত জমে আছে। আমিন সাহেব বসে আছেন তার সামনে। রাহেলা বললেন, 'কি হয়েছে?'

ঃ মিছিলে গিয়েছিলাম চাচী। হঠাৎ পুলিশ তাড়া করলো। দৌড়াতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেছি।

ঃ ঠোঁট তো দেখি অনেকখানি কেটেছে।

ঃ না, বেশি না।

আমিন সাহেব বললেন, 'খুব মিছিল হচ্ছে, না?'

ঃ খুব হচ্ছে।

ঃ ওদের এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা, ঠিক না?

আমিন সাহেব হেসে উঠলেন। রাহেলা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হাসির কোনো ব্যাপার হয়নি। তুমি হাসছো কেন?'

ঃ হাসির ব্যাপার না, তবে আনন্দের ব্যাপার।

ঃ আনন্দের ব্যাপারটা কোথায়?

আমিন চাচা গম্ভীর হয়ে বললেন—একটা সিংহ তার ক্ষমতা বুঝতে পারছে, ব্যাপারটা আনন্দের নয়? রাহেলা জবাব দিলেন না। ডাক্তারকে টেলিফোন করতে গেলেন। টেলিফোনে রিং হচ্ছে না। অনেকবার চেষ্টা করা হলো। রাহেলা মুখ কালো করে বললেন—পৃথিবীর কোনো দেশে এত খারাপ টেলিফোন সার্ভিস আছে বলে আমার জানা নেই।

খোকনের সমস্তটা দিন খুব খারাপ কেটেছে। ভয়াল ছয়ের একজন মানুষকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বল্টু ও টুনু দু'জনেই দেশের বাড়িতে চলে গেছে। অবস্থা ভাল না হলে এরা ফিরে আসবে না। সাজ্জাদকেও তার বাসায় পাওয়া গেল না। সে কোথায় গেছে তাও জানা গেল না। সাজ্জাদের বোন কোনো কথারই জবাব দিতে পারেন না। শুধু কাঁদেন। অনেক ঝামেলা করে মুনীরকে পাওয়া গেলো। মুনীরের কাছে স্যার এসেছেন—ইংরেজি পড়াচ্ছেন। মুনীর এক ফাঁকে বলে গেল, 'একটু দাঁড়া, স্যার এক্ষুণি চলে যাবেন।' খোকন অপেক্ষা করতে লাগলো। স্যার যেতে অনেক দেরি করলেন। বসে থাকতে থাকতে খোকনের প্রায় যখন ঘুম ধরে গেল তখন স্যার গেলেন। খোকন বললো, 'দুপুরে পড়িস তুই?'

ঃ হু। বাবা স্যার রেখে দিয়েছেন। স্কুল তো এখন বন্ধ, কাজেই ঘরে বসে যতটুকু পারা যায়। তোদের ভয়াল ছয়ের কি অবস্থা?

ঃ ভালই।

ঃ ভাল আর কোথায়, সব তো চলেই গেছে। তুই আর সাজ্জাদ এই দু'জন ছাড়া তো এখন আর কেউ নেই।

ঃ ওরা আবার আসবে, তখন হবে।

ঃ এসব জিনিস একবার ভেঙে গেলে আর হয় না।

ঃ তোকে বলেছে।

খোকনের বসে থাকতে ভাল লাগছিলো না। সে এক সময় বললো, 'ঘুরতে যাবি?'

ঃ কোথায়?

ঃ ঐ রাস্তায়, আর কোথায়?

ঃ না ভাই। বাবা রাগ করবেন। তাছাড়া বিকেলে আমার কাছে আরেকজন স্যার আসবেন। অঙ্ক স্যার।

ঃ কয়টা স্যার তোর?

ঃ বেশী না এই দু'জনেই। বৃত্তি পরীক্ষা আসছে তো, তাই।

খোকন একা একা অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো। ফার্মগেট থেকে হেঁটে হেঁটে চলে গেলো শাহবাগ এভিন্যু পর্যন্ত। শাহবাগের মোড়ে কিসের যেন জটলা। লোকজন বলাবলি করছে 'জঙ্গী মিছিল' আসছে পুরান ঢাকা থেকে, একটা কাণ্ড হবে। একজন স্যুট টাই পরা ভদ্রলোক বললেন, 'খোকা তুমি বাড়ি যাও।' খোকন বাড়ি গেল না, পাক মটরস পর্যন্ত গিয়ে চলে গেলো কলাবাগানের দিকে। সেখানেও প্রচুর গণ্ডগোল, একটা পুলিশের ট্রাক পুড়ছে। সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। খোকনের দেখার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ভীড় গলে ভেতরে ঢুকতে পারলো না। একটা দমকলের গাড়ি এসে থেমে আছে। কেউ সেটাকে যেতে দিচ্ছে না। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো আশেপাশে কোথাও পুলিশ বা মিলিটারির কোনো চিহ্ন নেই। খোকন কলাবাগানে কাটালো বিকেল পর্যন্ত। বাড়ি ফিরতে তাই সন্ধ্যা মিলিয়ে গেলো। বড়চাচা আজ নির্ঘাৎ ধরবেন। আজ বাড়িতে ভূমিকম্প হবে।

বড়চাচা অবশ্যি তাকে ধরলেন না। ধরলেন কবীর ভাইকে। রাতের খাবার শেষ হয়ে যাবার পরপরই বিচার সভা বসলো। আসামী মাত্র একজন। কবীর ভাই। বিচার সভা বসলো বড়চাচার লাইব্রেরি ঘরে। সবাই সেখানে উপস্থিত। কবীর ভাই মাথা নিচু করে সোফার

একটা কোণায় বসে আছেন। বড়চাচা থেমে থেমে বললেন, "তুমি একবার সকালবেলা একটা মিছিলের সঙ্গে জুটে গিয়ে ঠোঁট কেটে এলে। তারপরও বিকেলবেলা আবার গেলে। অথচ আমি অনেকবার বলেছি এইসব মিটিং মিছিল থেকে দূরে থাকবে। এই প্রসঙ্গে তোমার কি বলার আছে?"

কবীর ভাই চুপ করে রইলেন।

ঃ তোমার কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো। তোমার কি ধারণা যা করছ দেশের জন্যে করছো?

ঃ জ্বি।

ঃ ভুল ধারণা। হাঙ্গামা হুজ্জত করে দেশের কিছু হবে না। এতে দেশের অমঙ্গলই হবে, মঙ্গল হবে না, বুঝতে পারছ?

কবীর ভাই কিছু বললেন না। খোকনের আব্বা হঠাৎ কথা বলে উঠলেন। শান্ত স্বরে বললেন—আপনার কথাটা ঠিক না। আন্দোলন করে অনেক কিছু আদায় করা যায়। ভাষা আন্দোলনের কথা মনে করে দেখুন। সেদিন আমরা আন্দোলন না করলে আজ রাস্তাঘাটে উর্দুতে কথা বলতাম।

ঃ আন্দোলনের অনেক রকম পথ আছে। গান্ধিজী অহিংস পথে দেশকে স্বাধীন করেছেন।

আমিন চাচা বললেন—তার জন্যে গান্ধিজীর মত নেতা দরকার। সে রকম যখন নেই তখন আমাদের পথে নামা ছাড়া উপায় কি?

ঃ এই সব বাচ্চা ছেলেপুলে পথে নামবে?

ঃ নামবে না কেন? নামবে। অল্প বয়স থেকেই তাদের শিখতে হবে।

বড়চাচা দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন—'ভুট্টো সাহেব এসেছেন। আলোচনায় বসেছেন। এখন সব মিটমাট হবে। মিছিল ফিছিলের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এতে ওদেরকে শুধু ক্ষেপিয়েই তোলা হবে। কবীর আমার হুকুম অমান্য করেছে। কাজেই এর শাস্তিস্বরূপ সে আগামী এক সপ্তাহ ঘর থেকে বেরুতে পারবেনা। কবীর, আমি কি বলেছি তুমি বুঝতে পারছ?

ঃ পারছি।

ঃ আর শোন, যদি আমার কথার অবাধ্য হয়ে আবার বের হয়ে যাও, তাহলে এ বাড়িতে এসে আর ঢুকতে পারবে না।

বড়চাচা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

রাত দশটায় ভয়েস অব আমেরিকা থেকে বলা হলো—'শেখ মুজিব ও ভূট্টোর মধ্যে কথাবার্তা এগুচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তাঁরা একটা আপোসে পৌঁছবার চেষ্টা করছেন। শহরের পরিস্থিতি আগের মতই। চারদিকে থমথমে ভাব, যা আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত দেয়।'

রাতে ঘুমতে যাবার আগে খোকনের মা খোকনকে ডেকে পাঠালেন। কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'তুই আজও গিয়েছিলি ?' খোকন চুপ করে রইলো। তিনি খুব কাঁদতে লাগলেন। খোকন বললো, 'কাঁদছ কেন ?'

ঃ কাদঁবো না! তুই যেখানে সেখানে যাবি। আমি খোঁজও নিতে পারি না তুই কোথায় যাস, কি করিস। আর কোথাও যাবি না।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আমার গা ছুঁয়ে বল কোথাও যাবি না।

খোকন মাথা নিচু করে বসে রইলো।

ঃ আয় না বাবা আয়।

খোকন এগিয়ে যেতেই মা তার হাত ধরে ফেললেন। খোকনের কেন জানি খুব লজ্জা করতে লাগলো।

সাজ্জাদের বাড়ি ফিরতে ভাল লাগে না।

তার বোনটি সারাক্ষণ কাঁদে। কাঁদে নিঃশব্দে। সাজ্জাদ কিছুই করতে পারে না। শুধু বসে থাকে চুপচাপ। বড়ই একা একা লাগে তার।

মামাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনো খবর এখনো এসে পৌঁছায়নি। এখন তারা কি করবে তা বুঝতে পারছে না। দেশের বাড়িতে চলে যাবে ? কিন্তু কেউ নেই সেখানে। ছোট্ট একটা বাড়ি ছিলো। নদীর ভাঙনে কোথায় চলে গেছে। কে এখন আর জায়গা দেবে ? তাছাড়া সাজ্জাদের বোন কোথাও যেতে চায় না। যদি কখনো মানুষটি ফিরে আসে ? রাতের বেলা খুব কম করে হলেও সে দশবার জেগে উঠবে। সাজ্জাদকে ডেকে বলবে—মনে হলো কেউ যেন এসেছে, আয় দরজাটা খুলি।

ঃ কেউ না আপা।

ঃ খোল না তুই। এ রকম করছিস কেন?

দরজা খোলা হয়। কোথাও কিছু নেই। একটা কুকুর দরজার পাশে বসে হাই তুলছে শুধু।

সাজ্জাদের বয়স দ্রুত বেড়ে যেতে লাগলো। আমাদের বয়স বাড়ে অভিজ্ঞতার সঙ্গে। সেই সময়ে অত্যন্ত দ্রুত সাজ্জাদের অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগলো। একদিন সে তার বোনের দুল নিয়ে বিক্রি করে এলো সোনার দোকানে। দোকানী খুব সন্দেহ নিয়ে তাকাচ্ছিল তার দিকে। সরু গলায় বলেছিলো—কার গয়না খোকা বাবু?

ঃ আমার বড় বোনের।

ঃ তাকে বলে এনেছ?

ঃ হ্যাঁ। সে নিজেই দিয়েছে।

ঃ দেখ খোকাবাবু, তুমি তোমার বোনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

ঃ কেন?

ঃ আমার মনে হচ্ছে জিনিসটা তুমি না বলে এনেছ। তুমি যাও বোনকে নিয়ে এসো। আর শোন, অন্য দোকানে যাবে না। তুমি ছোট মানুষ, ঝামেলা টামেলা হবে।

সাজ্জাদ বোনকে নিয়ে এসেছিল। তারপরও দু'দিন আসতে হলো। একবার একটি চুড়ি নিয়ে। আরেকবার আংটি নিয়ে। দোকানদার এর পর আর কিছু বলত না। সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতো। শেষবার খুব শান্ত গলায় বললো, 'এইভাবে আর কতদিন চলবে? এবার তো অন্য কিছু চেষ্টা করা দরকার।'

ঃ কি চেষ্টা করব?

ঃ একটা কাজ টাজ করার চেষ্টা কেমন মনে হয়?

ঃ কি কাজ?

ঃ তাও ঠিক। তোমার যে বয়স তাতে কি কাজ আর করবে? তবে খোকাবাবু দিন আর এ রকম থাকবে না। তুমি ভেঙে পড়বে না। দেশের অবস্থা বদলাবে। মানুষের ভাগ্যও বদলাবে। তুমি কি কিছু খাবে?

ঃ জ্বি না।

ঃ খাও। একটা কিছু খাও। এই যাতোরে একটা মিষ্টি আন। বুঝলে খোকাবাবু, এখন তোমার যে দুঃসময় সে দুঃসময় আমাদের সবার। তবে এটা থাকবে না।

এই লোকটির সঙ্গে সাজ্জাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। তার দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় সাজ্জাদ উঁকি দিতো আর সে হাসি

মুখে বলতো—'আরে খোকাবাবু যে এসো এসো। দেশের কি খবর বলতো? ওরে একটা মিষ্টি দিতে বল তো।' অনেক রকম গল্প-গুজব হতো তার সঙ্গে। মজার মজার সব গল্প।

ঃ বুঝলে খোকাবাবু, গয়নার দোকানের মালিকরা মানুষের দুঃখের গল্পগুলো খুব ভাল জানে। আমরা চোখের সামনে কতজনকে নিঃস্ব হতে দেখি। বড় খারাপ লাগে খোকাবাবু।

সাজ্জাদ বুঝতে পারে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। প্রায়ই তার বোন ভয় পাওয়া গলায় বলে—এখন কি হবে? সাজ্জাদ জবাব দিতে পারে না।

ঃ আর কয়েকদিন পর তো ঘরে রান্না হবে না। তখন কি করবি?

ঃ আমি কাজ করব।

ঃ তোকে কে কাজ দেবে? একবার তোর দুলাভাইয়ের অফিসে বরং যা। দেখ ওরা কি বলে?

ঃ ওরা কি বলবে?

ঃ জানি না কি বলবে। গিয়ে দেখ না।

একদিন সাজ্জাদ গেল সেখানে। এবং আশ্চর্য লোকগুলো খুবই যত্ন করলো তাকে। বারিন বাবু বলে এক ভদ্রলোক বললেন—তুমি চিন্তা করবে না। এই কারখানাতেই তোমার একটা ব্যবস্থা করব। পড়াশোনা যা করছিলে তাই করবে, অবসর সময়ে কাজ শিখবে। ফেরার সময় বারিন বাবু বললেন—"তোমার দুলাভাইয়ের কাছ থেকে একবার পঞ্চাশ টাকা ধার করেছিলাম, সেটা ফেরত দেয়া হয়নি তোমার কাছে দিয়ে দিই, কেমন?' তখন দেখা গেল আরো অনেকেই একই কথা বলছে। কেউ দশ টাকা ধার নিয়েছিলো। কেউ কুড়ি টাকা।

সাজ্জাদের মনে হলো লোকগুলো মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মিথ্যে কথা এমন মধুর হয় কি করে কে জানে। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

বারিন বাবু তাকে কোলে করে একটি রিকশায় এনে তুলে দিলেন। ভরাট গলায় বললেন—তোমরা কোথায় থাকো জানতাম না। জানলে আরো আগে এসে খোঁজ নিতাম। এখন থেকে খোঁজ খবর রাখব। তোমার কোন ভয় নেই।

সাজ্জাদ বাড়ি ফিরে দেখে দাদুমণি ও নীলু বসে আছে তাদের বাসায়। নীলুর মুখ দারুণ হাসি হাসি। এবং আশ্চর্য, বহুদিন পর

দেখা গেল তার বোন কাঁদছে না। দাদুমণি বললেন, 'এই যে সাজ্জাদ বাবু, তুমি কোথায় ছিলে? তোমার জন্যেই বসে আছি। কাপড় চোপড় রেডি কর সময় নাই।'

সাজ্জাদ অবাক হয়ে তাকালো।

: তোমরা দু'জন এখন থেকে আমাদের সঙ্গেই থাকবে। তোমার বোনকে রাজি করিয়েছি।

সাজ্জাদ কিছু বুঝতে পারলো না।

'তোমার কোনো সুবিধার জন্যে বলছি না। আমার এবং নীলুর সুবিধার জন্যে। নীলু একা একা থাকে। তোমরা থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হবে ঘোরাঘুরি করতে পারি। তাইনাগো দাদুমণি?' নীলু হাসি মুখে বললো—হ্যাঁ। দাদুমণি বললেন, 'ঢাকায় আমরা কত দিন থাকতে পারি তা অবশ্যি জানি না। যদি শেখ মুজিব আর ভুট্টোর মধ্যে কথা-বার্তায় কোন ফল না হয়, তাহলে ঢাকা ছাড়তে হবে। আমরা সবাই মিলে তখন গ্রামে চলে যাব। নীলগঞ্জে আমার একটা বড় বাড়ি আছে।' নীলু হাসি মুখে বললো—খুবই সুন্দর বাড়ি। বাড়ির পাশে একটা ছোট নদী আছে। নদীর নাম সোহাগী। সাজ্জাদের বোন ইতস্তত করে বললো, 'ওর দুলাভাই যখন ফিরে এসে দেখবে কেউ নেই তখন?'

: আমরা এ পাড়ার সবাইকে বলে যাব। তাছাড়া সে আমাদের খুঁজে বের করবে। আমরা তো তাকে কম খোঁজাখুঁজি করিনি, কি বল?

পঁচিশে মার্চ দুপুর থেকেই সবার ধারণা হলো কিছু একটা হয়েছে। হয়তো ভুট্টো আর ইয়াহিয়া ঠিক করে ফেলেছে এ দেশের মানুষদের কোনো কথা শোনা হবে না। চারদিক থমথম করতে লাগলো। খোকনের বড়চাচা দুপুর একটায় অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ঘরে ফিরলেন। ফিরেই বললেন, 'আজ যেন কেউ ঘর থেকে বের না হয়। সবাই যেন ঘরে থাকে। কবীর কোথায়, কবীরকে ডাক।'

কবীরকে কোথাও পাওয়া গেল না। বড়চাচা থমথমে গলায় বললেন—ও কোথায় গিয়েছে? কেউ জবাব দিতে পারলো না।

: খোকনকে ডাক।

খোকন নিচে নেমে এলো। বড়চাচা বললেন, 'কবীর কোথায় জান?'

ঃ জ্বি না।

ঃ তুমি আজ ঘর থেকে বেরুবে না।

ঃ কেন চাচা?

ঃ শহরের অবস্থা ভাল না। শহরে মিলিটারি নামবে, এ রকম একটা গুজব শোনা যাচ্ছে।

খোকন কিছু বুঝতে পারলো না। মিলিটারি তো নেমেই আছে। নতুন করে নামবে কি? বড়চাচা বললেন—তোমার ঐ বন্ধুটি, সাজ্জাদ যার নাম—ও কোথায় আছে?

ঃ ও আছে দাদুমণির বাসায়।

ঃ কার বাসায়?

ঃ একজন বুড়ো ভদ্রলোকের বাসায়। ওনাকে আমরা দাদুমণি ডাকি।

ঃ করেন কি উনি?

ঃ আমি জানি না চাচা।

ঃ তাঁর বাসায় আমাকে একদিন নিয়ে যাবে। আমি ঐ ছেলেটির জন্যে কিছু করতে চাই।

ঃ জ্বি আচ্ছা, আমি নিয়ে যাব।

ঃ এখন যাও দারোয়ানকে ডেকে নিয়ে এসো।

দারোয়ান আসামাত্র বড় চাচা বললেন—কবীর যখন ফিরবে, তাকে ঢুকতে দেবে না। বলবে এ বাড়িতে তার জায়গা নেই। সে যেন তার নিজের পথ দেখে নেয়। বুঝলে?

আমিন চাচা সন্ধ্যাবেলা মুখ কালো করে ঘরে ফিরলেন। চা খেতে খেতে বললেন শেখ মুজিবুর রহমান যে প্রেস কনফারেন্স ডেকেছিলেন সেটা বাতিল হয়ে গেছে। ব্যাপার কি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

খোকনরা যখন ফার্স্ট ব্যাচে খেতে বসেছে তখন দারোয়ান এসে খবর দিল কবীর ভাই এসেছে, গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বড়-চাচা বললেন—তুমি এই খবরটি আমাকে দিতে এসেছ কেন? তোমাকে বলে দিয়েছি না ওকে ঢুকতে দেবে না? যাও, যা বলেছি তাই কর। বড়চাচী বললেন—সে কোথায় থাকবে রাত্রে?

ঃ যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকবে, এ বাড়িতে না।

ঃ তুমি এটা ঠিক করছ না।

ঃ আমি যা করছি ঠিকই করছি।

ঃ না ঠিক করছ না।

ওপর থেকে খোকনের বাবা নেমে এলেন। তিনি অত্যন্ত শান্ত গলায় বললেন—ভাইয়া, ছেলেটাকে ঘরে আসতে দিন।

ঃ যে ছেলে আমার কথা শোনে না, সে আমার বাড়িতে থাকবে না।

ঃ আমরা বড়রা মাঝে মাঝে ভুল কথা বলি, সে সব কথা সব সময় মানা যায় না।

ঃ আমি ভুল কথা বলি ?

ঃ না, আপনি ভুল কথা কম বলেন। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে ভুল করছেন। সবাইকে মূল আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছেন। এটা ঠিক না।

বড়চাচা তাকিয়ে রইলেন। খোকনের বাবা শান্ত স্বরে বললেন, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় এক সময় এইসব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদেরই বন্দুক হাতে তুলে নিতে হবে। আপনি নিশ্চয়ই চান না আপনার ছেলেমেয়েরা পরাধীন হয়ে থাক। চান ? বলুন আপনি চান ?

ঃ না চাই না।

ঃ তাহলে এমন করছেন কেন ?

বড়চাচা ক্লান্ত স্বরে বললেন—ওকে ভেতরে আসতে বল। যাও বল ভেতরে আসতে।

দারোয়ান ছুটে গেলো। কিন্তু গেটের বাইরে কাউকে গাওয়া গেল না। আমিন চাচা তক্ষুণি খুঁজতে বের হলেন। বড়চাচী কাঁদতে শুরু করলেন।

খোকন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলো, যদি কবীর ভাই ফিরে আসেন। আমিন চাচা ফিরলেন দশটায়। কবীর ভাইকে কোথাও পান নি। তার মুখের ভাব-ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে তিনি ভীষণ চিন্তিত।

গভীর রাতে খোকনকে ডেকে তোলা হল। বাবা এসে খুব নরম গলায় বললেন—খোকন তোমার মা'র শরীর খুব খারাগ, এসো মায়ের পাশে বস।

মায়ের ঘরে সবাই আছেন। বড়চাচা মাথা নিচু করে বসে আছেন একটি ছোট চেয়ারে। বড়চাচী মার হাত ধরে কাঁদছেন। মায়ের মুখ নীল বর্ণ। নিংশ্বাস নিতে পারছেন না। বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছেন। নার্সটি বললো—হাসপাতালে নিরে যাওয়া দরকার। এক্ষুণি হাসপাতালে নেয়া দরকার। কিন্তু সবাই এমন ভাব করছে যেন তার কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। খোকন অবাক হয়ে তাকালো

বাবার মুখের দিকে। কেন, হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে না কেন? বাবা শান্ত স্বরে বললেন—পাকিস্তানী মিলিটারিরা আক্রমণ শুরু করেছে খোকন। রাস্তায় মিলিটারি ছাড়া আর কিছু নেই। আজ রাতে কাউকে পাওয়া যাবে না। আজ রাতে কিছুই করার নেই!

খোকন নিজেও শুনতে পেলো প্রচণ্ড গোলাগুলি হচ্ছে। ট্যাংক নেমে গেছে রাস্তায়। বড়চাচা মৃদু স্বরে কি যেন বললেন। কেউ শুনতে পেলো না! নার্স আবার বললো—একজন ডাক্তার দরকার। সবাই চুপ করে রইলো। বাবা বললেন, 'খোকন মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াও।'

শুরু হলো একটি অন্ধকার দীর্ঘ রাত। মানুষের সঙ্গে পশুদের একটা বড় পার্থক্য আছে। পশুরা কখনো মানুষের মত হৃদয়হীন হতে পারে না। পঁচিশে মার্চের রাতে হৃদয়হীন একদল পাকিস্তানী মিলিটারি এ শহর দখল করে নিল।

তারা উড়িয়ে দিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন। জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলেও প্রতিটি ছাত্রকে গুলি করে মারলো। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢুকে হত্যা করলো শিক্ষকদের। বস্তিতে শুয়ে থাকা অসহায় মানুষদের গুলি করে মেরে ফেললো বিনা দ্বিধায়। "বাঙালিদের বেঁচে থাকা না থাকা কোনো ব্যাপার নয়। এরা কুকুরের মত প্রাণী, এদের মৃত্যুতে কিছুই যায় আসে না। এদের সংখ্যায় যত কমিয়ে দেয়া যায় ততই মঙ্গল। এদের মেরে ফেল। এদের শেষ করে দাও।"

এক রাত্রিতে এ শহর মৃতের শহর হয়ে গেল। অসংখ্য বাবারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরে গেল না। অসংখ্য শিশু জানলো না বড় হয়ে ওঠা কাকে বলে। বেঁচে থাকার মানে কি?

শহরের জনশূন্য পথে দৈত্যাকৃতি ট্রাক চললো। ধ্বংস ও মৃত্যু। স্বজনহারা মানুষের কান্নার সঙ্গে ঠাঠা শব্দে গর্জাতে লাগলো মেশিনগান। জেনারেল টিক্কা খান বাঙালির মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। যেন এরা দ্বিতীয়বার আর পাকিস্তানীদের মুখের ওপর কথা বলার স্পর্ধা না পায়!

পরদিন ভোরবেলা পাকিস্তানের জনদরদী ভুট্টো চলে গেল পাকিস্তানে। সে মহা উল্লসিত। প্লেনে ওঠার আগে হাসি মুখে বলে গেল—'যাক শেষ পর্যন্ত শত্রুদের হাত থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেল।'

ছাব্বিশে মার্চের সমস্তদিন কেউ ঘর থেকে বেরুতে পারলো না। শহরে কার্ফু। ঘরে বসে শুধুই প্রতীক্ষা। এর মধ্যেই আবার অবাঙালিরা যোগ দিল মিলিটারিদের সঙ্গে। বলে দিতে লাগলো—কাদের কাদের শেষ করে দিতে হবে। চারদিকে মৃত্যু আর মৃত্যু।

ছাব্বিশ তারিখ ভোর এগারোটায় ইয়াহিয়ার ভাষণ প্রচারিত হলো।

> "..শেখ মুজিবকে বিনা বিচারে আমি ছেড়ে দেব না। আওয়ামী লীগ দেশের শত্রু। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। আমার দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী দেশকে শত্রুমুক্ত করতে এগিয়ে এসেছে। এবারো তাদের পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে..."

দেশের লোক হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কি হচ্ছে এসব! কি হচ্ছে ঢাকা শহরে? কিছুই জানার উপায় নেই। ঢাকা বেতার থেকে অনবরত হামদ ও নাতে রসুল প্রচারিত হচ্ছে।

পাশের দেশ ভারত। সেখানকার বেতারেও কোনো খবর নেই। এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে গেছে, তারা কি কিছুই জানে না? কোলকাতা বেতার থেকে দুপুর বেলা হঠাৎ করে 'গীতালি' অনুষ্ঠান বন্ধ করে বলা হল—

"পূর্ব বাংলায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, পূর্ব বাংলা রেজিমেন্ট, পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ, পূর্ব পাকিস্তান আনসারস, পূর্ব পাকিস্তান মুজাহিদ দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।"

ঘোষণা শেষ হওয়া মাত্র বাজানো হলো সেই বিখ্যাত গান—'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" এই দেশে শুরু হলো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জীবনযাত্রা।

ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে মৃতদেহ পড়ে রইলো। সরাবার লোক নেই।

নীলু খুব মন খারাপ করে একা বসে ছিল। রাত প্রায় আটটা। চারদিক অন্ধকার। ইলেকট্রিসিটি আছে। তবু রান্নাঘরের বাতিটি ছাড়া আর সব বাতি নিভিয়ে রাখা হয়েছে। দাদুমণি নীলুর ঘরে ঢুকে

জিজ্ঞেস করলেন—একা একা বসে আছ কেন ? এসো আমার সঙ্গে এসে বস।

ঃ না।

ঃ ভয়ের কিছু নেই নীলু।

ঃ আমার ভয় করছে না।

ঃ সাজ্জাদরা কোথায় ?

ঃ জানি না। রান্নাঘরে বোধ হয়।

ঃ আমি কি বসব তোমার সঙ্গে ?

ঃ জানি না, ইচ্ছে হলে বসেন।

দাদুমণি বসলেন। নীচু স্বরে বললেন—আমরা গ্রামে চলে যাব। সুযোগ পেলেই চলে যাব। নীলু কিছু বললো না। দাদুমণি বললেন—কার্ফু ওদের এক সময় তুলতেই হবে। হবে না ?

ঃ তুলতেই হবে কেন ? না তুললে কে কি করবে ?

দাদুমণি এর উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর হাতে একটি ট্রানজিস্টার। তিনি বিদেশের রেডিও স্টেশনগুলো ধরতে চেষ্টা করছেন। পারছেন না। এই ট্রানজিস্টারটি বেশি ভাল না। ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে এখনো হামদ আর নাতে রসূল হচ্ছে। মাঝে মাঝেই ইংরেজি বাংলা ও উর্দুতে বলা হচ্ছে—

"শহরে কারফিউ বলবত আছে।"

সাজ্জাদ ও সাজ্জাদের বোন চুপচাপ রান্নাঘরে বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। রান্না-বান্না হয়ে গেছে। শুধু ডাল ভাত। কিন্তু কেউ খেতে বসছে না। কারো খিদে নেই। এক সময় সাজ্জাদের বোন কি বললো। সজ্জাদ জবাব দিল না। তার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। এটা এমন একটা সময় যখন কারোর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। সাজ্জাদ দেখলো দাদুমণি দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি নরম স্বরে বললেন—

ঃ সাজ্জাদ, তোমরা রান্নাঘরে বসে আছ কেন ? এসো সবাই এক সঙ্গে বসি। নীলুকেও ডেকে নিয়ে এসো, ও খুবই মন খারাপ করছে।

নীলু এলো না। তার নাকি কিছুই ভাল লাগছে না। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দাদুমণি এলেন তাকে নিতে।

ঃ একা একা থাকলে আরো খারাপ লাগবে।

ঃ না লাগবে না।

ঃ তাহলে বরং খেয়ে ঘুমিয়ে পড়।

ঃ আমি এখন ঘুমবো না।

দাদুমণি চলে এলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল নীলু দরজা বন্ধ করে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়েছে। ট্রাংক খুলে তার বাদামী রঙের খাতা বের করেছে। এখানে সে মাঝে মাঝে নিজের মনের কথা লেখে। সেই লেখাগুলো খুব গোপন। কেউ পড়তে পারে না। এমন কি দাদুমণিও না। তিনি জানেনও না যে তার এ রকম একটা খাতা আছে। এটি সে জন্মদিনে পাওয়া টাকায় নিজে গিয়ে কিনে এনেছে। নীলু খাতা সামনে রেখে পুরোনো দু'একটা লেখা পড়লো, তারপর লিখতে শুরু করলো ঃ

নীলুর ডাইরী

২৬শে মার্চ

রাত ন'টা

আমরা আজ সারাদিন ঘরে বন্দি হয়ে আছি। খুব খারাপ লাগছে আমার। বাইরের সব দরজা জানালা বন্ধ। বারান্দায় উঁকি দেয়ার হুকুম নেই। এত খারাপ লাগছে। এই দেশটা লরা মেরীর দেশের মত কেন হলো না? তাহলে কী চমৎকার হতো! ঘাসের বনে একটা ছোট্ট কুটির বানিয়ে আমরা থাকতাম। শীতকালে তুষার ঝড় হতো। জানালার পাশে বসে বসে দেখতাম সাদা বরফে চারদিক ঢেকে যাচ্ছে। দাদুমণি ঘরে একটা আগুন করে মজার মজার সব গল্প বলা শুরু করতেন। বাইরে ঝড়ের মাতামাতি। কোথাও যাবার উপায় নেই। এখনো অবশ্যি কোথাও যাবার উপায় নেই। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে কত তফাৎ। আমার খুব খারাপ লাগছে। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।

এইটুকু লেখা হওয়া মাত্রই খুব কাছেই কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির শব্দ হতে লাগলো। ক্যাট ক্যাট করতে লাগলো মেশিন গান। দাদুমণি নীলুর দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভীত স্বরে বললেন, 'দরজা খোল নীলু।'

নীলু দরজা খুললো না। দাদুমণি দরজায় ধাক্‌কা দিতে দিতে বললেন—মেঝেতে শুয়ে পড় নীলু, মেঝেতে শুয়ে পড়।

নীলু তাও করলো না। পাথরের মূর্তির মত বসে রইলো। গুলির শব্দ থেমে গেল, কিন্তু একজন পুরুষ মানুষের চিৎকার শোনা যেতে লাগলো। ভয়াবহ চিৎকার। নীলু দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। তার মুখ রক্তশূন্য। সে কাঁপা গলায় বললো, 'ওর কি হয়েছে দাদুমণি?'

ঃ জানি তো না নীলু।

ঃ কেউ কি দেখতে যাবে না ওর কি হয়েছে?

দাদুমণি সে কথার জবাব দিতে পারলেন না। নীলু দ্বিতীয়বার বললো, 'কেউ কি যাবে না?'

সাতাশ তারিখ চার ঘন্টার জন্যে কার্ফু তোলা হল। মানুষের ঢল নামলো রাস্তায়। বেশির ভাগই শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। করুণ অবস্থা। যানবহন সে রকম নেই। সময়ও হাতে নেই। যে অল্প কয়েক ঘন্টা সময় পাওয়া গেছে তার মধ্যেই শহর ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। পথে পথে মানুষের মিছিল, কিন্তু এই মিছিলের চরিত্র ভিন্ন।

বড় রাস্তার সব ক'টি মোড়ে সৈন্যবাহিনী টহল দিচ্ছে। তাদের চোঁখে মুখে ক্লান্তি ও উল্লাস। তাদের ধারণা যুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে। তারা অলস ভঙ্গিতে নতুন ধরনের মিছিল দেখছে। এই মিছিলে আকাশ ফাটানো ধ্বনি নেই। এই মিছিলের কেউ পাশের মানুষটির সঙ্গেও কথা বলে না। শিশু কেঁদে উঠলে মা বলেন—চুপ চুপ। শিশুরা কিছুই বোঝে না, তারা কাঁদে এবং হাসে। নিজের মনে কথা বলে। বয়স্ক মানুষেরা বলে—চুপ চুপ।

যারা পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে অনেককেই কাঁদতে দেখা যায়। তাদের কি হয়েছে? প্রিয়জন পাশে নেই? যার রাতে বাড়ি ফেরার কথা ছিল সে কি ফেরেনি? প্রশ্ন করবার সময় নয় এখন। যে চার ঘন্টা সময় পাওয়া গেছে, এর মধ্যেই শহর ছাড়তে হবে। সময় ফুরিয়ে আসছে। সবাই দ্রুত যেতে চেষ্টা করে। শিশুরা হাসে ও কাঁদে। কোনো কিছুই তাদের বিচলিত করে না।

মিলিটারিরা দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জনস্রোত দেখে। তাদের চকচকে বন্দুকের নল রোদের আলোয় ঝকমক করে। তারা মাঝে মাঝে কথা বলে নিজেদের মধ্যে, মাঝে মাঝে হেসে ওঠে। নিশ্চয়ই কোনো আশা ও আনন্দের গল্প। মজার কোন স্মৃতি নিয়ে তামাশা। ওদের উচ্চস্বরের হাসির শব্দে শুধু শিশুরাই অবাক হয়ে তাকায়। আর কেউ তাকায় না।

কার্ফু শুরু হয় চারটায়। রাস্তাঘাট আবার জনশূন্য হয়ে যায়। শহরের অবস্থা যারা দেখতে বেরিয়েছিলো,তারা ঘরে ফিরে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে যায়। দাদুমণি ঘন্টাখানিকের জন্যে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরেই শান্ত স্বরে বললেন—শহর ছাড়তে হবে। কালই আমরা শহর ছাড়ব। তারপর আর কোনো কথা বলেন না। বিকেলে চারটা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি তাঁর ঘরে একা একা বসে থাকেন।

খোকনদের বাড়ি খুব চুপচাপ হয়ে গেছে।

অঞ্জু আর বিলু এখন আর চেঁচিয়ে এক্কা দোক্কা খেলে না। বড়-চাচা সারাদিন তাঁর নিজের ঘরেই বসে থাকেন। কারো সঙ্গে বিশেষ কথা-টথা বলেন না। খোকনও বেশির ভাগ সময় থাকে তার নিজের ঘরে। সময় শ্লথ হয়ে গিয়েছে। মা মারা গেছেন মাত্র তিন দিন আগে, অথচ খোকনের কাছে মনে হয় বহু বৎসর কেটে গেছে। আজ সকাল-বেলা হঠাৎ কি মনে করে খোকন তার মায়ের ঘরে গেল। সবকিছু আগের মত আছে। মার লাল রঙের চটি দুটি পর্যন্ত যত্ন করে তুলে রাখা।

ঃ খোকন।

খোকন দেখলো, বাবা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে।

ঃ কি করছ খোকন?

ঃ কিছু করছি না।

ঃ এসো, আমার ঘরে এসো। আমরা গল্প করি।

খোকন তার বাবার সঙ্গে চলে এলো। বাবাও যেন কেমন হয়ে গেছেন। হঠাৎ করে তাঁর যেন অনেক বয়স বেড়ে গেছে।

ঃ খোকন, মা'র জন্যে খারাপ লাগছে?

ঃ হুঁ।

ঃ লাগাই উচিত।

বাবা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ব্যক্তিগত দুঃখই সবচে বড় দুঃখ। আমাদের কথাই ধর। আমরা নিজেদের দুঃখে কাতর হয়ে আছি ঠিক না?'

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কিন্তু দেশের কি অবস্থা হচ্ছে বুঝতে পারছ তো? খুব খারাপ অবস্থা। এবং যতই দিন যাবে ততই খারাপ হবে।

খোকন কিছু বললো না। নিচ থেকে এই সময় বড়চাচীর কান্না শোনা গেল। বাবা চুপ করে গেলেন। কবীর ভাই এখনো ফিরে আসেননি। বড়চাচী দিন রাত সর্বক্ষণ তাঁর জন্যে কাঁদেন। দিনের-বেলা কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু রাতেরবেলা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাবা বললেন, 'একমাত্র মহাপুরুষদের কাছেই ব্যক্তিগত দুঃখের চেয়েও

দেশের দুঃখ বড় হয়ে ওঠে। আমরা মহাপুরুষ নই। আমাদের কাছে আমাদের কষ্টটাই বড় কষ্ট।

বড়চাচীর কান্নার শব্দ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। বাবা চুপ করে বসে রইলেন। তারপর প্রসঙ্গ বদলবার জন্যে বললেন—তোমার কি মনে হয় বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন?

ঃ আমি জানি না।

ঃ সে তো কেউ জানে না। কিন্তু তোমার কি মনে হয়?

ঃ আমার কিছু মনে-টনে হয় না।

ঃ এভাবে কথা বললে তো হবে না খোকন। এখন থেকে আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে। খুব খারাপ সময় আমাদের সামনে।

খোঁকন চুপ করে রইলো। বাবা শান্ত স্বরে বললেন—

ঃ এখন ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে। সেই যুদ্ধ অনেকদিন পর্যন্ত হয়তো চলবে। এর মধ্যেই তোমরা বড় হবে। কি খোকন, চুপ করে আছ কেন? কিছু বল।

ঃ কি বলব?

ঃ ওদের সঙ্গে যুদ্ধ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে।

ঃ কে বলেছে?

ঃ বোঝা যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি। তোমার কি মনে হয় হচ্ছে না?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ খোকন, এই যুদ্ধে কে জিতবে?

উত্তর দেবার আগেই ছোটচাচী এসে বললেন খাবার দেয়া হয়েছে।

রাহেলাকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর জীবনের ওপর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। গত দু'রাতে এতটুকুও ঘুমতে পারেননি। তাঁর চোখের নিচে কালি পড়েছে। মুখ ফ্যাকাশে। বাবা বললেন, 'আমরা একটু পরে আসি?'

ঃ না, এখনই চলে আসেন। ঝামেলা সকাল সকাল চুকে যাক।

ঃ আসছি, আমরা আসছি।

খাবার টেবিলে বড়চাচা বললেন—আমাদের এখন কি করা উচিত, গ্রামে যাব? আমিন চাচা গম্ভীর মুখে বললেন—গ্রামে পালিয়ে গিয়ে কি হবে?

ঃ এখানে এ রকম আতঙ্কের মধ্যে থাকা। সবার মনের ওপর খুব চাপ পড়ছে।

ঃ গ্রামে পালিয়ে গেলেও সেই চাপ কমবে না। তা ছাড়া কবীর কোথায় আছে আমরা জানি না। ওকে এখানে ফেলে রেখে যেতে পারি না।

ছোটচাচার কথা শেষ হবার আগেই রাহেলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো, 'আমি কোথাও যাবো না। আমি আমেরিকা চলে যাব। আমি এই দেশে থাকব না।'

আমিন চাচা কি একটা বলতে চাইলেন। বড়চাচা ইশারা করে তাকে থামিয়ে দিলেন। রাহেলা শিশুদের মত কাঁদতে শুরু করলেন।

ঃ সব ঠিক হয়ে যাবে রাহেলা।

ঃ না কিছুই ঠিক হবে না।

ঃ শান্ত হয়ে বস।

ঃ আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

হঠাৎ আমিন চাচা বললেন—সবাই চুপ। একটি কথাও না। সবাই তাকালো তাঁর দিকে! তিনি চাপা গলায় বললেন—

ঃ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ঃ কিসের শব্দ ?

ঃ আমার মনে হয় একটা মিলিটারি গাড়ি এসে থেমেছে।

সবাই নিঃশব্দ হয়ে গেলো। দীর্ঘ সময় কেউ কোনো কথা বললো না। গেটের কাছে কুকুরটি শুধু ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। আমিন চাচা ভুল শুনেছিলেন। ওটা কোনো মিলিটারি গাড়ি ছিল না।

সাজ্জাদরা নীলগঞ্জে এসে পৌঁছলো আটাশ তারিখ সন্ধ্যায়। খুব ঝামেলা করে আসা। প্রথমে শোনা গেল মীরপুর ব্রীজ কাউকে পার হতে দেওয়া হচ্ছে না। মিলিটারি চেক পোস্ট বসেছে। যারাই শহর ছাড়তে চাচ্ছে তাদেরকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। যাদের কথাবার্তা পছন্দ হচ্ছে না, তাদের আলাদা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের ভাগ্যে কি ঘটছে কিছু বলা যাচ্ছে না। দাদুমণিরা মীরপুর ব্রীজের কাছে এসে পৌঁছলেন দুপুরে। তের চৌদ্দজন মিলিটারির একটা দলকে সেখানে সত্যি সত্যি দেখা গেল। এবং দেখা গেল দু'টি ছেলেকে ওরা কি সব যেন জিজ্ঞেস করছে। ছেলে দুটি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। নীলু বললো, 'ওদেরকে কি জিজ্ঞেস করছে ?' দাদুমণি উত্তর দিলেন না। নীলু বললো, 'ওরা এ রকম করছে কেন ?'

ঃ তুমি ওদিকে তাকিও না। ওদের যা ইচ্ছে করুক।

সাজ্জাদের বোন বললো, 'ওরা আমাদেরকে ধরবে?'

ঃ না, আমাদের ধরবে না।

ওরা সত্যি সত্যি কিছু বললো না। তবে বাস থেকে প্রতিটি লোককে নামালো। এবং কোনো কারণ ছাড়াই বুড়োমত একটা লোকের পেটে হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো দিল। লোকটি উল্টে পড়ে কোঁ কোঁ শব্দ করতে লাগলো। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে মিলিটারির সেই জোয়ান হাত নেড়ে সবাইকে বাসে উঠতে বললো। সবাই বাসে উঠলো। বুড়ো লোকটি উঠতে পারল না। তার সম্ভবত খুব লেগেছে। সে মাটিতেই গড়াগড়ি খেতে লাগলো। নীলু ফিস ফিস করে বললো, 'ওকে মারলো কেন দাদুমণি। ও কি করেছে?'

ঃ জানি না। কিছু করেছে বলে তো মনে হয় না।

ঃ তাহলে শুধু শুধু মারলো কেন?

ঃ মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে চায়। এই জন্যেই এইসব করছে। কিংবা হয়ত অন্য কিছু। আমি জানি না।

আরিচাঘাটে পেঁছে খুব মুশকিল হলো। ফেরী নেই। নৌকায় করে কিছু লোকজন পারাপার করছে। কিন্তু নৌকার সংখ্যা খুবই কম। নৌকা জোগাড় হলো না। মাথার ওপর কড়া রোদ। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। নীলু বললো—তার শরীর খারাপ লাগছে।

দাদুমণি চিন্তিত মুখে বললেন, 'ঢাকায় ফিরে যাওয়াই বোধ হয় ভাল। সাজ্জাদ কি বল?'

ঃ না, ঢাকায় যাব না।

ঃ নীলু তুমি কি বল?

নীলু থেমে থেমে বললো—আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে।

সন্ধ্যার দিকে একটা ট্রাক এলো, সেটি আবার ঢাকা ফিরে যাবে। ট্রাকের ড্রাইভার বললো—আপনারা যাবেন ঢাকায়?

না গিয়েই বা উপায় কি? রাত কাটানোর একটা জায়গার দরকার। ট্রাকে উঠেই নীলুর প্রচণ্ড জ্বর এসে গেল। সে দু'বার বমি করে নেতিয়ে পড়লো।

আকাশের অবস্থা ভাল না। ঝড় বৃষ্টি হবে হয়তো। দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সাজ্জাদের বোন নীলুকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। আরো চারজন মহিলা আছেন ওদের সাথে। ওরা সবাই বসেছে পাশাপাশি। তাঁদের সঙ্গে তিন-চার বছরের দুটি ফুটফুটে বাচ্চা। এরা ঘুমিয়ে

পড়েছে। ট্রাকে বসে থাকা লোকগুলো কোন কথা বলছে না। সবাই চিন্তিত। সবাই তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে। একজন কে যেন বললো, 'বৃষ্টি নামলে মুশকিল হবে।' কেউ তার জবাব দিল না।

কিছুদূর যাবার পর ট্রাককে আবার ফিরে আসতে হল আরিচা ঘাটে। ঢাকায় যাওয়া যাবে না। খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। মিলিটারিরা নাকি মার্চ করে আসছে।

তারা সারারাত বৃষ্টি মাথায় করে ট্রাকে অপেক্ষা করল। নদী পার হবার নৌকা পাওয়া গেল না। কি কষ্ট কি কষ্ট!

সাজ্জাদরা নীলগঞ্জে পৌঁছলে আটাশ তারিখ রাতে। এগারো মাইল হেঁটে প্রচণ্ড জ্বর এসে গেলো নীলুর। সে কয়েকবার বমি করলো। কোথায় ডাক্তার কোথায় কি। নীলগঞ্জের লোকজন পালাচ্ছে, কারণ দেওয়ান বাজারে মিলিটারি এসে গেছে। তারা নির্বিচারে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। দেওয়ান বাজার নীলগঞ্জ থেকে মাত্র পাঁচ মাইল।

মিলিটারিরা এদিকেই হয়তো আসবে। নীলগঞ্জের লোকজন নৌকায় করে সুখানপুকুরের দিকে পালাচ্ছে। নীলু বললো, 'দাদুমণি আমি কোথাও যাব না।' দাদুমণি বললেন, 'সুখানপুকুরে ডাক্তার পাওয়া যাবে।' নীলু থেমে থেমে বললো, 'আমার ডাক্তার লাগবে না।' দাদুমণি কি করবেন ভেবে পেলেন না।

ঃ সাজ্জাদ কি করা যায়? যাবে সুখানপুকুরে?

ঃ চলেন যাই।

নৌকা জোগাড় করতে অনেক সময় লাগলো। কেউ যেতে চায় না। গতরাতে নাকি নদীতে গানবোট এসেছিলো। আজও হয়তো আসবে। মাঝিরা বললো—

ঃ হাঁটা পথে যান। হগ্‌গলেই হাঁটা পথে যাইতাছে।

ঃ অসুস্থ একটা মেয়ে সাথে আছে। হাঁটা পথে যাওয়া যাবে না। বড় নদীতে না গিয়ে যেতে পারবে না? বিশাখালি দিয়ে যাও।

কেউ রাজি হয় না। একজনকে শুধু পাওয়া গেল। তার নৌকাটা ছোট। দুপুর রাতে তারা সবাই খোলা নৌকায় করে রওনা হলো। অনেক লোকজন। একটি মাত্র নৌকা।

সে রাতে আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো। সুখানপুকুরের কাছাকাছি আসতেই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগলো।

ঠিক এই সময় রোগামত একটি ছেলে চেঁচিয়ে বললো—'চুপ চুপ। শুনেন সবাই শুনেন। ছেলেটির হাতে একটি ট্রানজিসটার। সে বেতারের ট্রানজিসটার উঁচু করে ধরলো। চেঁচিয়ে বললো—স্বাধীন বাংলা অনুষ্ঠান। স্বাধীন বাংলা বেতার।

ঘোষকের কথা পরিষ্কার নয়। ট্রানজিসটারে ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। তবু সবাই শুনলো—

"ওরা জানে না আমরা কি চীজ। জানে না ইবিআর কি জিনিস। আমরা ওদের টুটি টিপে ধরেছি। তুমুল যুদ্ধ চলছে। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।"

ঘোষকের কথা শেষ হওয়া মাত্র রোগা ছেলেটি বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—"যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর আমাদের ভয় নাই। বলেন ভাই সবাই মিলে, জয় বাংলা।" নৌকার প্রতিটি মানুষ আকাশ ফাটানো ধ্বনি দিল। ছেলেটি বললো—

ঃ আবার বলেন।

ঃ জয় বাংলা।

ঃ বলেন, 'জয় বঙ্গবন্ধু।'

ঃ জয় বঙ্গবন্ধু।

নীলু আচ্ছন্নের মত পড়ে ছিল। সে বিড় বিড় করে বললো, 'কি হয়েছে?'

সাজ্জাদ হাসতে হাসতে বললো, 'নীলু, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর আমাদের ভয় নেই। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বললো।'

ঃ কে যুদ্ধ করছে?

ঃ বাঙালি মিলিটারিরা।

ঃ শুধু ওরা?

ঃ না আমরাও করব। আমিও যাবো।

ঃ তোমাকে কি ওরা নেবে?

সাজ্জাদ দৃঢ় স্বরে বললো, 'নিতেই হবে।'

যুদ্ধ শুরু হলো। রুখে দাঁড়ালো বাঙালি সৈন্য, বাঙালি পুলিশ, আনসার ও মুজাহিদ বাহিনী। তাদের সঙ্গে যোগ দিল এ দেশের

মানুষ। বৃদ্ধরা যেমন এগিয়ে এল, তেমনি এগিয়ে এল, নিতান্তই অল্পবয়েসী কিশোরেরা। তাদের সবচে বড় অস্ত্র, মাতৃভূমির জন্যে ভালবাসা। দেখতে দেখতে সেই সহায় সম্বলহীন বাহিনী একটি মহা-শক্তিমান দুর্ধর্ষ সৈন্যদলে পরিণত হলো। এদের যুদ্ধ মুক্তির জন্যে, তাই এদের আমরা ভালবেসে ডাকলাম মুক্তিবাহিনী। এদের স্বপ্ন একটিই—অন্ধকার রজনীর শেষে এরা আনবে একটি সূর্যের দিন।

একটি সূর্যের দিনের জন্যে এ দেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দান করতে হলো।

পরিশিষ্ট

খোকন মে মাসের শেষদিকে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবার জন্যে একটি চৌদ্দ বছরের বালককে 'বীর প্রতীক' উপাধি দেওয়া হয়। মেথিকান্দা অপারেশনে এই বালক শত্রুর গুলিতে নিহত হয়। তার নাম সাজ্জাদ। একবার এই ছেলেটি 'ভয়াল ছয়' নামের একটি ছেলেমানুষী দল গঠন করেছিলো। এবং ঠিক করেছিলো 'ভয়াল ছয়ের' সদস্যরা পায়ে হেঁটে আফ্রিকার গহিন অরণ্য দেখতে যাবে।

ছেলেমানুষদের কত রকম স্বপ্ন থাকে।

———